সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জানুয়ারি ২০১৭

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস

০১. ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী মনোহর পারিকরের ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ

০২. ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ বিদেশ প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবরের জিএফএমডিবিষয়ক নবম বৈশ্বিক ফোরামে যোগদান উপলক্ষ্যে ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ

০৩. ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ নতুন দিল্লিতে ভারতের রেলমন্ত্রী শ্রী সুরেশ প্রভুর সঙ্গে বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী মো. মুজিবুল হকের সাক্ষাৎ

০৪. ২৯-৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মৌলভীবাজার শিল্প ও বণিক সমিতি আয়োজিত বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী উৎসব এবং ব্যবসায় সম্মেলন-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী তপন চক্রবর্তী

০৫. ২ ডিসেম্বর ২০১৬ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার ভারতীয় হাই কমিশনের বাংলা ওয়েবসাইট উদ্বোধন

০৬. ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকার পেট্রোবাংলা ভবনে ভারতের *মেসার্স পেট্রোনেট এলএনজি লিমিটেড* ও বাংলাদেশের *মেসার্স পেট্রোবাংলার* মধ্যে পেট্রোবাংলা ভবনে আয়োজিত সমঝোতা স্মারকে পেট্রোনেটের এমডি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রী প্রভাত সিং ও *পেট্রোবাংলার* সচিব জনাব সাঈদ আশফাকুজ্জামানের স্বাক্ষর

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ পঁয়তাল্লিশ | সংখ্যা ০১ | পৌষ-মাঘ ১৪২৩ | জানুয়ারি ২০১৭

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

ইনস্টিটিউট অফ জেনোমিক্স এ্যান্ড ইন্টেগ্রেটিভ বায়োলজি পৃষ্ঠা: ০৭

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিকরের বাংলাদেশ সফর	০৪
	মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বীরদের ঢাকায় সংবর্ধনা	০৫
	ঢাকায় ৯ম জিএফএমডি বৈঠকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী	০৫
	ভারতীয় ভিসার ক্ষেত্রে আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন নেই	০৬
উচ্চশিক্ষা	ইনস্টিটিউট অফ জেনোমিক্স এ্যান্ড ইন্টেগ্রেটিভ বায়োলজি ॥ ড. নিশীথকুমার পাল	০৭
প্রবন্ধ	বিবেকানন্দের পত্রাবলি ॥ ড. মারুফী খান	৯
	যেভাবে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু হয়ে উঠলেন এম দত্ত	১২
	জ্যোতির্ময়ী বিদ্যাদেবী ॥ সরস্বতীরানী পাল	১৪
ছোটগল্প	আমার না বলা বাণী ॥ মীনাক্ষী সিংহ	১৭
উৎসব	ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবস ॥ আবদুল মান্নান	২০
কবিতা	কনক চৌধুরী ॥ মুজিবুল হক কবীর	
	গোলাম নবী পান্না ২৪ ॥ প্রদীপ মিত্র	২৫
ধারাবাহিক	পাসিং শো ॥ অমর মিত্র	২৬
রাজ্য পরিচিতি	মিজোরাম	৩১
অনুবাদ গল্প	সুলতানের ব্যাটারি ॥ অরবিন্দ আদিগা	৩৭
ভ্রমণ	দিল্লি দর্শন ॥ জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া	৪৩
শেষ পাতা	প্রজাতন্ত্র দিবস	৪৮

৩১ থেকে ৩৬

অ্যান্থুরিয়াম

উদ্যান ও ফুলচাষে মিজোরাম অনেক এগিয়ে। অ্যান্থুরিয়াম (বছরে ৭০ লাখেরও বেশি) ও গোলাপ উৎপাদন ও রপ্তানিতে বিশ্বে মিজোরামের অবস্থান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কলা, আদা, হলুদ, প্যাশন ফল কমলা ও চৌচৌ উৎপাদন ও দেশজ সরবরাহে মিজোরামের সুনাম আছে। মিজোরামের কৃষি উৎপাদন খুবই কম। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও মাটির জল ধারণক্ষমতা না থাকায় এবং সেচ অবকাঠামোর অপ্রতুলতায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। তবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কম হওয়ায় সবজি ও ফলমূলের জৈব চাষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। মিজোরামে ৭০ লক্ষ টনের বেশি অ্যান্থুরিয়াম উৎপন্ন হয় এবং স্থানীয় বাজার ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও জাপানে রপ্তানি হয়। মিজোরামের মেয়েরা এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত।

সম্পাদক **নান্টু রায়**
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ৯৫৬২১৯৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর **ভারতীয় হাই কমিশন**
বাড়ি ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

একটি চিঠির সত্য-মিথ্যা

অনেকদিন আগে *ভারত বিচিত্রায়* একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল। চিঠিটির ভাষা ছিল হৃদয়স্পর্শী। পত্রিকাটির সম্পাদনা পর্ষদের মনে আছে কিনা জানি না, তবে আমার মনে আছে। মনে থাকতে পারে আরো দু'একজন পাঠকের– যারা একটু গভীরে গিয়ে পড়েন, যারা স্বাভাবিক স্রোতধারার বাইরে গিয়ে কিছু চান। সব লেখা সৃষ্টিশীল নয়। সব লেখা কৌতূহলের জন্ম দেয় না। কোন কোন লেখার শরীরগাছে বিছানো একটু বেশি সবুজ– একটু বাড়তি আল্পনা। এই রকমই একটা ক্ষুদ্রায়তনের ছোট স্বপ্ন, ভাষার রঙেবোনা একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল *ভারত বিচিত্রার* বুকভরা আঙিনায়।

প্রথমেই বলেছি, চিঠিটির ভাষা ছিল হৃদয়স্পর্শী। আর যা হৃদয়স্পর্শী তা অতলস্পর্শীও বটে। অদ্ভুত সুগন্ধ মাখা ছিল চিঠিটায়। যারা পড়েছিলেন, সবাই এক ধরনের আলো খুঁজে পেয়েছিলেন এর মধ্যে। এই চিঠিটির যা চাওয়া ছিল সেটা যদি আমার কাছে করা হত আমি সঙ্গে সঙ্গেই তা দিয়ে দিতাম, বলতে পারেন গুরুদক্ষিণাসহ। এত আকুলতা মাখা ছিল এর আঁচলে।

একটি চিঠি। ছোট্ট একটি চিঠি। রহস্য ছিল এর মধ্যে, উন্মোচন ছিল এর মধ্যে। নিজের গোপন পরিচয় এত খোলামেলা– বিশেষ করে রেকর্ড করার মত পরিবেশ সাধারণত কেউ দিতে চান না। নিজের দুর্বলতার কথা কে স্বীকার করেন! কিন্তু এই চিঠিটিতে এ-সব কোন ব্যাপার ছিল না। অকৃত্রিম নিখাদ একটি সত্য খুব সহজে অকপটে বলে ফেলা হয়েছিল। চিঠিটি পড়ে আমি ভেবেছিলাম এত সাহস পত্রলেখক পেলেন কোথা থেকে। এ তো সুন্দর এক দুঃসাহস! এ তো ভীরু কাপুরুষ নয়। সত্যকে এত সহজ করে নির্দ্বিধায় বলা যায়! যেখানে চারিধারে গোপনীয়তার এত হিড়িক! কোন সংখ্যায় তা আজ আর আমার মনে নেই। হয়তো বহু আগে। এরপর অনেক বছর গেছে। *ভারত বিচিত্রার* অনেক সংখ্যা জোয়ারের জলের মত বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ চিঠিটি– পত্রলেখকের আকুতিটি সময়কে খামচে ধরে আছে। তার ভাষায় শৃঙ্খলে সময় থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাই *ভারত বিচিত্রার* চিঠিপত্রের কলাম যখন পড়ি– ঐ চিঠিটা মেঘের মত ভেসে ভেসে আসে মনে। আমি জানি না *ভারত বিচিত্রা* কর্তৃপক্ষ তার আকুল পিপাসাটা নিবারণ করেছিলেন কিনা।

একটি চিঠি। ছোট্ট একটি চিঠি। রহস্য ছিল এর মধ্যে, উন্মোচন ছিল এর মধ্যে। নিজের গোপন পরিচয় এত খোলামেলা– বিশেষ করে রেকর্ড করার মত পরিবেশ সাধারণত কেউ দিতে চান না। নিজের দুর্বলতার কথা কে স্বীকার করেন! কিন্তু এই চিঠিটিতে এ-সব কোন ব্যাপার ছিল না। অকৃত্রিম নিখাদ একটি সত্য খুব সহজে অকপটে বলে ফেলা হয়েছিল। চিঠিটি পড়ে আমি ভেবেছিলাম এত সাহস পত্রলেখক পেলেন কোথা থেকে। এ তো সুন্দর এক দুঃসাহস!

চিঠিটি যখন পড়ি– তখন *ভারত বিচিত্রা* আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হত। কারণ গ্রামের ঠিকানায় অনেক অপেক্ষার পর একটি তরতাজা পত্রিকা হাতে পাওয়ার আনন্দ অপরিসীম। কেউ কেউ ঐ বয়সে প্রেমের চিঠির অপেক্ষা করে। আমরাও করতাম– *ভারত বিচিত্রার* প্রতিটা সংখ্যাই ছিল আমাদের কাছে প্রেমিকার চিঠির মত। পিয়নের ডাকবাক্স খুলতে দেরি হত কিন্তু পোস্ট অফিসে আগে থেকে ছুটে যাওয়া আমাদের চোখগুলি কিন্তু এতটুকু দেরি করত না চিঠিপত্রের ওপর আছড়ে পড়তে।

খুব গভীরভাবে পড়তাম *ভারত বিচিত্রা* হাতে নিয়ে। আজও যেমন পত্রিকাটি হাতে নিয়ে প্রথমেই কবিতাগুলি পড়ি, তখনও ঐ না-বোঝা আধাবোঝা বা আবেগী বোঝা বোধ নিয়ে কবিতাগুলিই আগে পড়তাম। এরপর অন্যান্য বিষয় একের পর এক। চিঠিপত্রের ঠিকানায় যদি কোন নিকট গ্রামের পত্রলেখকের নাম দেখতাম, আনন্দ আরও বেড়ে যেত।

আসলে *ভারত বিচিত্রা* নিয়ে এক ধরনের খেলা ছিল আমাদের। অনেক *ভারত বিচিত্রা* যেত আমাদের গ্রামে। প্রায় প্রতিটি পাড়ায়। এক এক ঘরে দুটো-তিনটে করে। এর একটি সংখ্যা বের হলে জোয়ারের মত ভরে যেত আমাদের গ্রাম। সেই হিসেবে প্রকৃত পাঠক ততটা ছিল না। অনেকেই ভাল করে পড়ত না পত্রিকাটি। তার নামে যে এত ভাল একটা পত্রিকা আসে, এটাই ছিল অহংকারের জায়গা। তবে পাঠক ছিল না তা কিন্তু নয়। অনেক সিরিয়াস পাঠক ছিল। অনেকে গর্ব করেই বলত– আমাদের গ্রামে এখনও ভাল পাঠক আছেন যারা দুপুরের ঘুম, স্কুলের অবসর কিংবা অলস সময়টা এর মধ্যেই মগ্ন রাখেন। এর মধ্যে আছেন শিক্ষার্থী, আছেন শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে, গৃহিণী, তরুণী বধু এবং আমার মত দু'একজন উঠতি সাহিত্যপ্রেমী। অনেক কৌতূহলভরেই তারা *ভারত বিচিত্রা* পড়েন।

এমনি একটি সংখ্যায় ঐ চিঠিটি পড়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। এও কী হয়? আমি একজন ডাক্তার, এ কথা গর্বের সঙ্গে বলা যায়। ঘাটের শ্রমিক, মাঠের কৃষক– এর মধ্যে তেমন অহংকার নেই, আবার অবহেলার জায়গা নেই। কিন্তু একজন পতিতা! চিঠির শুরুটা ছিল এরকম (যতদূর মনে আছে) আমি একজন পতিতা...। তিনি লিখেছেন, তিনি একজন পতিতা। তার ঘরে একজন ভদ্রলোক রাত্রিযাপন করেন। পরদিন সকালে ঐ ভদ্রলোক যখন চলে যান, ফেলে রেখে যান একটা *ভারত বিচিত্রার* কপি। তিনি ওটা পড়েন। পড়ে মুগ্ধ হন এবং ভাল লাগাকে, মুগ্ধতাকে ধরে রাখতে না পেরে *ভারত বিচিত্রা* কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখেন, অনুরোধ করেন তাকে ভারত বিচিত্রার গ্রাহক করে নিতে।

ভারত বিচিত্রা তার আবদার রেখেছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে এই চিঠিটি পড়ে বিশেষ কৌতূহল জেগেছিল। সত্য-মিথ্যার একটা দোলাচাল লক্ষ্য করেছিলাম মনে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম খোঁজ-খবর নিতে। যে গ্রাম থেকে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল সেটা ছিল আমার এক বন্ধুর গ্রাম। সাধারণত গ্রামে কোন পতিতালয় থাকে না। থাকতে পারে শহরে। থাকতে পারে মফস্বল শহরে। কিন্তু নির্ভেজাল সবুজ বেষ্টনীঘেরা গ্রামে পতিতালয় থাকার বিষয়টি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, বেমানানও।

তাই বিষয়টি মনে একটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল– সত্যিই কি কেউ এমন আছেন? একদিকে গ্রাম, তার ওপর পতিতাবৃত্তির কথা চিঠির প্রথম লাইনে সগৌরবে জানিয়ে দেওয়া– পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে খাপছাড়া মনে হয়েছিল। পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য (বিশেষ করে বিনামূল্যে) আমাদের ভানের অভাব নেই। পত্রিকাটির চিঠিপত্রের পাতা পড়লে মনে হয় যেন এর জন্য একেকজন জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু এর অর্ধেকেরও বেশি সত্য নয়। হঠাৎ আমার মন ডেকে বলেছিল এই চিঠিটা সে রকম কিছু নয় তো! চিঠিটি ছিল খুলনা জেলাধীন ডুমুরিয়া উপজেলার একটি গ্রাম থেকে লেখা। ঐ গ্রামে আমার এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে আমি একবার গিয়েছিলাম। বন্ধুকে বিষয়টি খুলে বললাম। সে তো আরও অবাক! আমাদের গ্রামে পতিতালয়! কি বলছ? তারপর তার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিলাম একটু ভাল করে খোঁজ-খবর নিতে। আমরা দু'জনেই শহরে থাকতাম। খুলনা শহরে নিবাস আমাদের ছিল বাগমারার *বাণী ছাত্রাবাসে*।

খুব মৃদু মৃদু টোকা দিয়ে দিয়ে কবিতার ভাষা হৃদয়ে প্রবেশ করে। কবি যখন কবিতা লেখেন এইভাবে কবিতার লাইন প্রবেশ করে কবির হৃদয়ে। তাই কবি কবিতা লিখতে পারেন। কবির ভাষা কবি তার চারপাশ থেকে খুঁজে নেন। চারিপাশ থেকে ভাষা ছুটে ছুটে আসে। বন্ধুর মাধ্যমে আমি যখন জানতে পারলাম ঐ গ্রামে এরকম কোন পতিতা কিংবা পতিতালয় নেই, মন মানতে চায়নি একেবারেই। এটা যে মিথ্যা তা কোনমতেই হতে পারে না! কারণ ঐ চিঠিটা যখন পড়ি, কল্পনায় একটা গ্রামের ছবি এঁকে ফেলেছিলাম মনে। একটা নির্জন রাস্তার পাশে খেয়াঘাটের ধারে এক কুঁড়েঘরে একজন কেউ *ভারত বিচিত্রা* পড়ছেন অলস বিকেলে, এরকম একটা ছবি আমি রচনা করেছিলাম কল্পনায়। সেই রমণী রূপবতী যৌবনবতী। দুনিয়াতে আর কেউ নেই তার। তিনি একা। মাঝে মাঝে তার ঘরে অতিথি আসেন। রাত কাটিয়ে চলে যান আর নিঃসঙ্গ রমণী রাতের স্মৃতিকে আড়াল করতে *ভারত বিচিত্রার* বুকে মুখ লুকান। এমনি একটা দৃশ্যকল্প সত্যি হয়ে গেঁথে রইল মনের ভেতর।

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া
একাউন্টস অফিসার/ফাইন্যান্স
বাংলাদেশ রেলওয়ে সি আর বি চট্টগ্রাম

সম্পাদকীয়

শীতের রিক্ততা এখনও প্রকৃতিতে লাগেনি। চারিদিক নিঃসীম শূন্যতা আর কুয়াশার চাদরে মোড়া। জবুথবু... তবু তারই মধ্যে সুর্যিমামা নতুন দিনের আগমনী বার্তা ঘোষণা করল। প্রথমদিনের সূর্যের আগমনী আমাদের সবার জীবনে পুষ্প-পল্লবের সজীবতা নিয়ে আসুক, এই প্রত্যাশা। স্বাগত ২০১৭। ইংরেজি নববর্ষে *ভারত বিচিত্রা*র অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই সপ্রীতি শুভেচ্ছা।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ এই ধরাধামে এসেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন ভারতবাসী তার আত্মগৌরব ভুলতে বসেছিল। কূপমণ্ডুকতা আর পুনর্জাগরণের কোলাহলে যখন নিজের ধর্মবিশ্বাস, দর্শন, সংস্কার, সভ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল, তখন স্বামীজী তাঁর পরম লৌকিক লোকায়ত গুরুর ধর্মবিশ্বাসকে বিশ্বমাঝে ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই আমার ভারত, এই আমার সভ্যতা। দিকে দিকে জয়ধ্বনি উঠল, ভারতের নবীন সন্ন্যাসী বিশ্বব্যাপী ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সনাতন বাণী পৌঁছে দিলেন, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়া... জগতের সবাই সুখী হোক, জগতের সবাকার মঙ্গল হোক...।' তরুণ প্রজন্ম স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হোন, তাঁর নির্ভীক যুক্তিবাদী মননশীল ও সহমর্মী চিন্তার আলোয় নিজেদের উদ্বুদ্ধ করুন, তাঁর জন্মতিথিতে এই আমাদের প্রার্থনা। নিবীর্য কলুষভরা পৃথিবীতে বিবেকানন্দের দর্শন আমাদের পাথেয় হতে পারে। চলতি সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলির উদ্ধৃতি সাজিয়ে একটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, যেখানে তাঁর দর্শন, অভিমত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। একশো বছর পেরিয়েও সে-সবের মূল্য ও তাৎপর্য আজও এতটুকু ম্লান হয়ে যায়নি।

আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার। কূপমণ্ডুকতার অন্ধকার দূর করতে বিজ্ঞানের আলোকশিখা অপরিহার্য। ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির খবরাখবর তুলে ধরবার প্রয়াস থাকে আমাদের। এবার ইনস্টিটিউট অফ জেনোমিক্স এ্যান্ড ইন্টেগ্রেটিভ বায়োলজির ওপর আলোকপাতের প্রয়াস রয়েছে যেখানে অ্যালার্জি ও শ্বাসতন্ত্রের গোলযোগ, নিউক্লিক এসিড ও পেপটাইড রসায়ন এবং অণুজীবীয় পরিবেশবিদ্যার মত বিষয়ে সক্রিয় গবেষণা পরিচালিত হয়। পাশাপাশি ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম স্তম্ভ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ওপর একটি মনোগ্রাহী রচনা পত্রস্থ হল যেখানে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু হয়ে উঠলেন। নিরহংকার আত্মভোলা এই বিজ্ঞানীর জন্মতিথিতে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিকরের বাংলাদেশ সফর

বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী মনোহর পারিকর ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকা সফর করেন। তাঁর সফরসঙ্গীদলে সেনা ও বিমান বাহিনির ভাইস চিফদ্বয়, নৌবাহির ডেপুটি চিফ, তটরক্ষা বাহিনির মহাপরিচালক ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এটি ভারতের কোন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর। সম্প্রতি নিষ্পত্তিকৃত স্থল ও সমুদ্রসীমার পর অনুষ্ঠিত এ সফরে দুই দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনিসমূহের মধ্যে বিনিময় বৃদ্ধি পায়। সফরটি মাননীয় মন্ত্রীর কোন প্রতিবেশী দেশেও প্রথম প্রথম সফর এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের গুরুত্বের ইঙ্গিতবাহী।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশর মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বাংলাদেশ সেনা ও বিমানবাহিনির প্রধানগণ, কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক এবং সশস্ত্র বাহিনি বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সফরকালে মন্ত্রী ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তিন বাহিনির গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গী প্রতিনিধিরা চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিও পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে মন্ত্রীর ব্যাপকভিত্তিক আলোচনায় দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনির মধ্যে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ ও ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধন আরো জোরদার হয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনির প্রচেষ্টার সামর্থ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে নতুন কিছু উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদর্শিত স্বয়ম্ভরতা অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন বাস্তবায়নে ভারতের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানান। আলোচনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যৌথ মহড়া অনুষ্ঠান, এইচএডিআর কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি এবং 'ব্লু ইকোনমি'র উদ্যোগ স্থান পায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্গ্রীব হয়ে আছেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী একটি এলুয়েট হেলিকপ্টার এয়ারফ্রেম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দেন। এই হেলিকপ্টারটি ভারতীয় বিমান বাহিনির সহায়তায় যে ৩টি আকাশযান নিয়ে 'কিলো' ফ্লাইট গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম যা ১৯৭১ সালে ডিমাপুরে ব্যবহৃত হয়। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধকালে সদ্যগঠিত বাংলাদেশ বিমানবাহিনির প্রথম ফাইটার হেলিকপ্টার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী যুদ্ধের সময় এই ফাইটার হেলিকপ্টারটি নিয়ে সকল প্রতিকূলতা জয় করে শত্রুপক্ষের বিপুল ধ্বংসসাধনে বাংলাদেশের বীর পাইলটদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

এটি ভারতীয় বিমান বাহিনির একটি আইএল ৭৬ এয়ারক্রাফ্টযোগে তাঁর বাংলাদেশে আগমনের দু'দিন আগে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবনে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই এয়ারফ্রেমটি দান করা হয়।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশের মুক্তযুদ্ধের কিছু বিরল আলোকচিত্র প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেন। আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য এসব স্মারক উপহার দেওয়া হয়।

স্কয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ (পরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনি প্রধান), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম এবং ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন এই হেলিকপ্টারযোগে অনেক অভিযান পরিচালনা করেন এবং সাফল্যের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় তেল ডিপো ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেন। সকল প্রতিকূলতা জয় করে বীরত্বব্যঞ্জক কাজের জন্য এই বীর পাইলটগণ 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ভারতীয় এনসিসি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ। যুব বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২জন অফিসার ও ২০জন ক্যাডেট ০৯-২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সফর করেন

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বীরদের ঢাকায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ২৮ ভারতীয় যোদ্ধা এবং ৪ সামরিক কর্মকর্তা তাঁদের স্ত্রী ও সহযোগীদের নিয়ে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ পাঁচদিনের সফরে ঢাকায় আসেন। অভিজ্ঞ এই যোদ্ধারা বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনির সার্ভিস প্রধানগণ এবং প্রধান স্টাফ অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের ওয়ার কোর্স ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা ক্লাব আয়োজিত ভিন্ন ভিন্ন অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ১৯৬৫ সাল ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জি এস সিহোতা (অব.) ভিআরসি, পিভিএসএম, এভিএসএম, ভিএসএম। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তদানীন্তন উড্ডয়নরত সেনা হেলিকপ্টারগুলির ক্যাপ্টেন এই সেনানী আকাশযুদ্ধে সমরাস্ত্র চালনা ও ঊর্ধ্বতন কমান্ডারদের পরিচালনার মাধ্যমে অনেক মিশনে নেতৃত্ব দেন। তিনি সিলেটে হেলিবোর্ন অপারেশনেও প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তাঁর হেলিকপ্টার শত্রুপক্ষের আক্রমণের শিকার হওয়ার পরও তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করেন। বিপুল সাহসিকতায় এসব যুদ্ধ পরিচালনায় অদম্য ভূমিকা রাখার জন্য তাঁকে 'বীরচক্র' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯৭১-এ ভারতীয় বিমানবাহিনির আরেক তরুণ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এয়ার কমোডর চন্দ্রমোহন সিংলাও একইভাবে আকাশযুদ্ধে অংশ নেন। সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তাঁকেও বীরচক্র প্রদান করা হয়। তিনি তাঁর সমসাময়িক সহকর্মীগণ বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন শামসুল আলম, স্কয়াড্রন লিডার বদরুল আলম এবং ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণ করেন। যুদ্ধকালে তাঁরা একত্রে শত্রু বাহিনির লক্ষ্যভেদে অসংখ্যবার লড়াই করেন। অসমসাহসী বাংলাদেশী পাইলটরাও 'বীর উত্তম' পুরস্কারে ভূষিত হন।

একইভাবে, 'অপারেশন জ্যাকপট'-এ অংশগ্রহণকারী 'বীর উত্তম' ও 'বীর প্রতীক' পদকপ্রাপ্ত কমোডর এ ডব্লিউ চৌধুরীও কমোডর বিজয় কপিল এবং লেফটেন্যান্ট সুরেশ কুমার মিত্তালের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের সুযোগ পান। ভারতীয় এই বীরেরা পাকিস্তানি জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে সমুদ্রপথে আক্রমণ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ নৌ কমান্ডোদলকে প্রশিক্ষণ দেন। এই দু'জন কর্মকর্তাও মুক্তিযুদ্ধকালে তাদের সাহসী কর্মকাণ্ডের জন্য 'বীরচক্র' লাভ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় যোদ্ধাদের মধ্যে পারস্পরিক এই সফর বিনিময় ২০০৫ সালে শুরু হয় এবং এ পর্যন্ত ২৮০জনেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা ও ১২৫জন ভারতীয় যোদ্ধা কলকাতা এবং ঢাকায় উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এই মহতী উদ্যোগ যোদ্ধাদের একে অপরের কাছে এনে দিয়েছে যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন। এই অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের জীবনের সেই উন্মাদনার মুহূর্ত ফিরে পান যখন উভয় দেশের জনগণ সেই দুঃসময়ে একে-অপরকে সহায়তা করেন। তাঁরা অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সময়ে একত্রে রক্ত ঝরিয়ে ভ্রাতৃত্বের এক আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হন।

পাশাপাশি, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য বাংলাদেশের ৩০ মুক্তিযোদ্ধা এবং ৬ সামরিক কর্মকর্তাসহ তাদের স্ত্রী ও সহযোগীদের একটি প্রতিনিধিদল ১৪ ডিসেম্বর কলকাতার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করে। বাংলাদেশ স্বরাষ্টমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের নেতৃত্বে এই মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধিদলে তিনজন সংসদ সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, কূটনৈতিকগণ, ঊর্ধ্বতন আমলা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা ফোর্ট উইলিয়ামসে বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম অংশগ্রহণকারী ভারতীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন। প্রতিনিধিদলটি শান্তিনিকেতন সফরশেষে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকায় ফিরে আসে।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদান দিবস স্মরণে ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এম এইচ মাহমুদ আলী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার অংশগ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান ॥ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতে শিক্ষাগ্রহণকারী বাংলাদেশী শিক্ষার্থী সমিতি (অ্যাবসি) আয়োজিত 'বিজয় দিবস ২০১৬: আমাদের বিজয়ে ভারতের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা অ্যাবসি সভাপতি অধ্যাপক ড. ডালেমচন্দ্র বর্মনের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন

ঢাকায় নবম জিএফএমডি বৈঠকে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

বিদেশমন্ত্রকের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবর ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকায় অভিবাসন ও উন্নয়ন (জিএফএমডি)বিষয়ক নবম বৈশ্বিক ফোরামে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ফোরামের মূল পর্বে 'অভিন্ন সুযোগ: অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে জোটবদ্ধতা– করণীয়' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অভিবাসন বিষয়ে বৈশ্বিক চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি নয়-দফাবিশিষ্ট পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন যা একটি কর্মভিত্তিক ফলাফল প্রদানে অবদান রাখতে পারে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে প্রস্তাবিত চুক্তিটি নারীর প্রতি সহিংসতা, পাচার, অন্যায়ভাবে শ্রম আদায়ে মানব পাচার এবং বৈধ অভিবাসন নির্ধারণ ও চিহ্নিত করার জন্য লিঙ্গসমতাভিত্তিক হতে হবে যা নির্দিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। তিনি অভিবাসন ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যসমূহ তুলে ধরেন এবং ভিন্ন ভিন্ন নীতি, অবকাঠামো এবং প্রক্রিয়ার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তব্যের শুরুতে এম জে আকবর ১৯৭১-এর ভয়াবহ সংকটের কথা স্মরণ করেন যখন এ অঞ্চলের উৎপীড়িত জনগণ নিরাপত্তা ও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে পড়েছিল। নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী বর্বর হত্যাকাণ্ডের পর এটিকে সুসংবদ্ধভাবে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার একটি দিন হিসেবেও স্মরণ করা হয়। তিনি ওই দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করেন যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর সুযোগ্যা কন্যা ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শক্তিশালী নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে আজও অব্যাহত রয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ ও উষ্ণ পরিবেশে আলোচিত বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিনিধিদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আকবর ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উষ্ণ শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন।

ভারতীয় ভিসায় এখন আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না

০১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত, উন্মুক্ত ও সহজ করার ভারতীয় হাই কমিশনের চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিশ্চিত বিমান, ট্রেন বা বাসের(যথাযথ বাংলাদেশ-ভারত বাস সার্ভিস কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত) টিকেটসহ বাংলাদেশী ভ্রমণকারীদের টুরিস্ট ভিসা আবেদনপত্র ই-টোকেন/আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারিখ ছাড়াই জমা নেওয়া হচ্ছে।

ভ্রমণেচ্ছুরা ভ্রমণের টিকেটসহ তাদের পূরণকৃত ভিসা আবেদনপত্র আইভিএসি মিরপুর, আলামিন আপন হাইটস, ২৭/১/বি (২য় তলা), শ্যামলী (শ্যামলী সিনেমা হলের বিপরীতে), মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭-এ সকাল ০৮.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা পর্যন্ত জমা দেবেন। ভ্রমণের তারিখ ভিসা আবেদনপত্রের জমাদানের ৭ দিন পরের তবে ১ মাসের মধ্যে হতে হবে।

নিশ্চিত বিমান, ট্রেন বা বাসের (যথাযথ বাংলাদেশ-ভারত বাস সার্ভিস কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত) টিকেটসহ নারী ভ্রমণকারী ও তাদের নিকটতম পরিবারের সদস্যদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সরাসরি আবেদনপত্র জমাদানের স্কিমটি আইভিএসি উত্তরার পরিবর্তে ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে আইভিএসি মিরপুর কেন্দ্রে অব্যাহত রয়েছে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারিখ/ই-টোকেনধারী আবেদনকারীদের টুরিস্ট ভিসা আবেদনপত্র আইভিএসি গুলশান, উত্তরা, মতিঝিল, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, যশোর, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেটে জমা দিতে পারবেন। আইভিএসি মিরপুর ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে নিশ্চিত ভ্রমণকারী ও প্রবীণ নাগরিকদের সরাসরি টুরিস্ট ভিসা আবেদনপত্র গ্রহণ করছে।

এসব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ভারত ভ্রমণের নিশ্চিত টিকেটসহ বাংলাদেশের কোন আবেদনকারীর আর ই-টোকেন/অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারিখের প্রয়োজন হবে না।

কূটনীতিক ও সরকারি পাসপোর্টধারীদের পরিবারের সদস্যদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন নেই

০১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে বাংলাদেশ থেকে কূটনৈতিক ও সরকারি পাসপোর্টকারীদের পরিবারের নিকটতম সদস্যদের টুরিস্ট ভিসা আবেদপত্র আইভিএসি উত্তরা, সেক্টর-৭, সড়ক-১৮, বাড়ি-৫৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ এ সকাল ০৯.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০টার মধ্যে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারিখ বা ই-টোকেন ছাড়াই জমা দেওয়া যাচ্ছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় মূল কূটনৈতিক/সরকারি পাসপোর্ট দেখাতে হবে এবং আবেদপত্রের সঙ্গে পাসপোর্টের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

শিশুদের টুরিস্ট ভিসায় আলাদা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না

০১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ভারত ভ্রমণেচ্ছু পিতা-মাতার সঙ্গে ১৮ বছরের নীচের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের টুরিস্ট ভিসার জন্য কোন আলাদা অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারিখ/ই-টোকেন প্রয়োজন হচ্ছে না। ভারতীয় ভিসা আবেদনকেন্দ্রসমূহে (আইভিএসিসমূহ) বাবা-মায়েরা তাদের টুরিস্ট ভিসা আবেদনপত্রের সঙ্গে শিশুদের আবেদনসমূহ জমা দেবেন। ভারতীয় ভিসা আছে এমন বাবা-মায়েদের যে কোন একজন তাদের শিশুদের পক্ষে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্ত ভিসার ফটোকপি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। ● বিজ্ঞপ্তি

উচ্চশিক্ষা

ইনস্টিটিউট অফ জেনোমিক্স এ্যান্ড ইন্টেগ্রেটিভ বায়োলজি

ড. নিশীথকুমার পাল

সাধারণ রোগের, যেমন অ্যালার্জি, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা ও বাত, আণবিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ থেকে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জেনোমের পার্থক্য বিশ্লেষণ এবং শিল্প-কারখানার বর্জ্য পরিশোধনের দ্রব্য ও প্রক্রিয়া থেকে আদর্শ বায়ো-ন্যানো বস্তুর ওপর গবেষণা পরিচালনা করছে দিল্লিতে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অফ জেনোমিক্স এ্যান্ড ইন্টেগ্রেটিভ বায়োলজি (আইজিআইবি)। ইতোমধ্যেই এটি ভারতের জেনোমিক্স গবেষণার একটি আদর্শ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেনোমিক্স গবেষণা, বায়োইনফরমেটিক্স এবং কম্পিউটেশনাল বায়োলজির মত আন্তঃশাখার তথ্যাদি ব্যবহার করে এই ইনস্টিটিউট ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও আণবিক ওষুধের মুখ্য ক্ষেত্রগুলির নতুন নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান করছে।

জীববিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদের একটি সুদক্ষ দল এখানে গবেষণা করেন এবং এঁদের সঙ্গে হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য একাডেমিক ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অ্যালার্জি ও শ্বাসতন্ত্রের গোলযোগ, নিউক্লিক এসিড ও পেপটাইড রসায়ন এবং অণুজীবীয় পরিবেশবিদ্যার মত কতকগুলি বিষয়ে এখানে সক্রিয় গবেষণা হয়। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল চিপের ওপর ভিত্তি করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জটিল রোগের জন্য ডায়াগনোস্টিক মার্কার শনাক্তকরণ এবং শক্তি উৎপাদন ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য অণুজীবীয় মেটা-জেনোমিক্স-এর ব্যবহার। এর সঙ্গে ন্যানো টেকনোলজির মত আন্তঃশাখার ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করছেন একদল বিজ্ঞানী।

উদ্ভব

ডায়াগনোস্টিক ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ভবিষ্যতে ভারতের প্রাচুর্যপূর্ণ বংশগতীয় সম্পদ একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে সেন্টার ফর বায়োকেমিক্যাল টেকনোলজি রূপান্তরিত হয়েছে আইজিআইবিতে। ভারতের বায়োমেডিক্যাল গবেষণার জন্য দুষ্প্রাপ্য রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য ১৯৬৬ সালে বায়োকেমিক্যাল ইউনিটে একটি গ্রান্ট-ইন-প্রোজেক্ট হিসেবে এই ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ড. বি কে বাচ্চায়াট এই ইউনিটের নামকরণ করেন 'সেন্টার ফর বায়োকেমিক্যালস্' এবং ১৯৭৭ সালে কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) একে অধিগ্রহণ করে এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি-র একটি বর্ধিত সেন্টার হিসেবে এটি কাজ করতে থাকে।

গত শতকের ৮০-র দশকের সূচনায় বায়োটেকনোলজির বিকাশের কথা মাথায় রেখে ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ড. এ পি জোশি মলিকিউলার বায়োলজির উপযোগী বিজ্ঞানীদের এই সেন্টারে নিয়োগ দেন। ১৯৯১ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বর্তমান ভবনে এই সেন্টারটি স্থানান্তরিত হয় এবং সেন্টার ফর বায়োকেমিক্যাল টেকনোলজি নামে সিএসআইআর-এর একটি স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউটে পরিণত হয়।

১৯৯২ সালে ড. এ পি জোশির দীর্ঘকালের সহকর্মী ড. শরৎ ভি গ্যাংগাল সেন্টার ফর বায়োকেমিক্যাল টেকনোলজির ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভি পি চেস্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যৌথভাবে এই ইনস্টিটিউট অ্যালারজেনস, অ্যাসপারজিলোসিস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য জলের মনিটরিংসহ পরিবেশতাত্ত্বিক বায়োটেকনোলজি, নিউক্লিক এসিড কেমিস্ট্রি, পেপটাইড কেমিস্ট্রি এবং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বিষয়ে উচ্চমানের গবেষণায় প্রধান ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৭ সালে প্রফেসর এস কে ব্রহ্মচারী এই সেন্টারের ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে মনুষ্য জেনোম সিকোয়েন্স

নির্ণয়ের লক্ষ্যে ফাঙ্কশনাল জেনোমিক্স-এর গবেষণা বেগবান হয়। তখন দেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সঙ্গে দ্রুত যৌথ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যেহেতু সেন্টার ফর বায়োকেমিক্যাল টেকনোলজির প্রধান গবেষণা জেনোমিক্সের দিকে প্রসারিত করা হয়, তাই ২০০২ সালে এর পুনঃনামকরণ হয় ইনস্টিটিউট অফ জেনোমিক্স এ্যান্ড ইন্টেগ্রেটিভ বায়োলজি।

প্রধান প্রধান অর্জন

কতকগুলি সাধারণ রোগের নতুন ওষুধ, ভ্যাকসিন এবং রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এখানকার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন।

অ্যালার্জি: ভারতের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি মানুষ বিভিন্ন প্রকার অ্যালার্জিজনিত রোগ, যেমন ব্রংকিয়াল অ্যাজমা, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস এবং একজিমাতে ভোগে। যেহেতু অ্যালার্জির শনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় অ্যালার্জেন নির্যাস ব্যবহৃত হয়, সেহেতু আইজিআইবি-র বিজ্ঞানীরা অ্যালার্জেন প্রমিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি ব্যবহার করে অ্যালার্জেনিক প্রোটিনের প্রকাশ এবং অ্যালার্জেনের গঠন ও কার্যের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎস, যেমন পরাগরেণু, ছত্রাক, পতঙ্গ, খাদ্যবস্তু ও ধূলোবালি থেকে অ্যালার্জেনের নির্যাস সংগ্রহ করে চিকিৎসক ও রোগীদেরকে প্রদান করা হয়েছে। এটি বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। অধিকন্তু, নতুন ওষুধ তৈরির লক্ষ্যে কতকগুলি অ্যান্টি-অ্যাজমেটিক অণু শনাক্ত করা হয়েছে।

যক্ষ্মা: ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ যক্ষ্মা যথেষ্ট মারাত্মক, যদিও বর্তমানে এর জন্য কার্যকর কেমোথেরাপি আবিষ্কৃত হয়েছে। ওষুধ তৈরির বর্তমান স্ট্রাটেজি হল জিনের উৎপাদিত বস্তু শনাক্ত করা যা এর জীবাণুর বেঁচে থাকা ও রোগ সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ এই তথ্য সুনির্দিষ্ট ওষুধ তৈরিতে সাহায্য করবে। বিপাকীয় গতিপথে যে-সব প্রোটিন অংশ নেয় এবং যা এই রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ামের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক, এ তথ্যও ওষুধ উদ্ভাবনে সহায়তা করবে। ক্লিনিক্যাল স্পেসিমেনে রোগ সৃষ্টিকারী মাইকোব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ অ্যামপ্লিফিকেশনের ওপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি এখানে উদ্ভাবিত হয়েছে।

অ্যাসপারজিলোসিস: অ্যালার্জিক ব্রোঙ্কোপালমোনারি অ্যাসপার-জিলোসিস হল এক প্রকার জটিল অ্যালার্জিজনিত গোলযোগ, যার কারণ হল রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস। সুনির্দিষ্ট ডায়াগনোস্টিক অ্যান্টিজেনের অভাবে স্ট্যান্ডার্ড ইমিউনোডায়াগনোস্টিক অ্যাসে লভ্য নয়। এখানকার বিজ্ঞানীরা এই রোগীদের জন্য একটি ডায়াগনোস্টিক কিট উদ্ভাবন করেছেন। অ্যান্টি ফাংগাল ওষুধ তৈরির লক্ষ্যে সম্ভাব্য জেনোমিক ও প্রোটিওমিক টার্গেট শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে।

অ্যানথ্রাক্স: ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টংকারের মত এক প্রকার রোগ হল অ্যানথ্রাক্স এবং ব্যাকটেরীয় টক্সিনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সুরক্ষা প্রদান করে। অ্যানথ্রাক্সের জন্য একটি থেরাপিউটিক অণু তৈরি করা হয়েছে যা টক্সিনকে নিরপেক্ষ করে এবং রোগীকে সুরক্ষা প্রদান করে। বিভিন্ন প্রকারের রিকম্বিনেন্ট ভ্যাকসিনও তৈরি করা হয়েছে। যে জিন অ্যানথ্রাক্সের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে, তাও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস: এই রোগীদের কনকানাভালিন-এ সংযুক্ত প্লাজমা প্রোটিনের পরিবর্তন পরীক্ষা করা হয়েছে। এসব রোগীর বৈষম্যমূলকভাবে প্রকাশিত কতকগুলি প্রোটিনও শনাক্ত করা হয়েছে।

ডায়াবেটিস মেলিটাস: ডায়াবেটিস মেলিটাস টাইপ ২ হল এক প্রকার বহুজিন (পলিজিন) নিয়ন্ত্রিত রোগ যার বংশানুসরণ বেশ জটিল। এই রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পলিমরফিজম অথবা মার্কার শনাক্তকরণের লক্ষ্যে এবং ভারতের জনগণের মধ্যে এর জটিলতা নিরূপণের জন্য আইজিআইবি-র বিজ্ঞানীরা সক্রিয়ভাবে গবেষণা করছেন।

জেনোমিক্স: এখানকার জেনোমিক্স গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম ব্যবহার করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও বহুভাষী জনগণের ইতিহাস অনুসন্ধান ও ওষুধ উদ্ভাবন করা। ইন্ডিয়ান জেনোম ভেরিয়েশন কনসোর্টিয়াম, যা গঠিত হয়েছে ছয়টি সিএসআইআর লেবরেটরির ১৫০ জনেরও বেশি বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে এবং এর প্রধান ভূমিকা পালন করছে আইজিআইবি, ভারতীয় জনগণের প্রথম বিস্তারিত জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করেছে। প্রধান প্রধান রোগে হুমকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে শনাক্ত করতে এই গবেষণার ফলাফল সহায়তা করবে। এসব জনগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত ওষুধ বাছাই করতে ফার্মাকোজেনোমিক্সের মত ক্ষেত্রে আরো গবেষণা করার পথ উন্মুক্ত হবে। ইন্ডিয়ান জেনোম ভেরিয়েশন ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে।

অ্যাজমা, ডায়াবেটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, স্নায়ুরোগ, শ্বাসতন্ত্রের অ্যালার্জি ইত্যাদি রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বংশজাতীয় ও পরিবেশীয় প্রভাবক শনাক্ত করা হয়েছে। কোন রোগের বেশি অথবা কম ঝুঁকির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পলিমরফিজমের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি এসব রোগের সংবেদনশীলতা হ্রাসের জন্য ওষুধ তৈরিতে সহায়তা করছে।

জেনোম ইনফরমেটিক্স: জেনোমিক ও প্রোটিওমিক প্রয়োগের জন্য এই ইনস্টিটিউটে একটি বলিষ্ঠ বায়োইনফরমেটিক্স বেস আছে এবং ডাটাবেস, ওয়েব সার্ভার এবং সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। মাইক্রো আরএনএ শনাক্তকরণের জন্যেও সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

বায়ো-ন্যানোবস্তু: সুস্বাস্থ্য ও রোগের ক্ষেত্রে ন্যানোবস্তু ও ন্যানোডিভাইসের ব্যাপক প্রয়োগ আছে। বায়োফিজিক্যাল এবং সেলুলার কৌশল প্রয়োগ করে আইজিআইবি-র আন্তঃশাখার বিজ্ঞানীদল জিন ডেলিভারির মৌলনীতি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, ডিএনএ ও আরএনএ ডেলিভারি এজেন্ট তৈরি করেছেন এবং ন্যানোকণার কোষীয় বিষাক্ততা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

পরিবেশতাত্ত্বিক বায়োটেকনোলজি: বিভিন্ন শিল্প-কারখানার বর্জ্যজল পরিশোধনের লক্ষ্যে আইজিআইবি ব্যাপকভাবে গবেষণা করেছে। জলের গুণগত মানের একটি ভাল নির্দেশক হল বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (BOD)। এটি নির্ণয়ের জন্য কতকগুলো বায়োসেন্সর উদ্ভাবিত হয়েছে। এছাড়াও, চর্মশিল্প ও কাগজশিল্পের বর্জ্যজলের ফেনল ও মোট দ্রবীভূত কঠিন বস্তুর পরিমাণ হ্রাসের জন্য সুনির্দিষ্ট অণুজীবীয় প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বর্জ্য পদার্থের অবায়ুজীবীয় ব্যবস্থাপনায় হাইড্রোজেনসহ বায়োগ্যাস তৈরি করার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উভয় দিকেই সুবিধা হয়। এই বিষয়েও এই ইনস্টিটিউটে গবেষণা হয়েছে। এছাড়াও, শাকসবজির বর্জ্য, ফলের বর্জ্য এবং পাম তেল কলের বর্জ্য নিয়েও এখানে অগ্রগণ্য গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

সুযোগ-সুবিধা

আইজিআইবিতে জেনোমিক গবেষণার ভাল সুযোগ-সুবিধা আছে। যেমন হাই থ্রুপুট অলিগোনিউক্লিওটাইড সিন্থেসাইজার, অ্যাফিমেট্রিক্স জেনোচিপ প্ল্যাটফরম, ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এ্যান্ড জিনোটাইপিং ফ্যাসিলিটি, ইলুমিনা বেডস্টেশন, অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপিক ফ্যাসিলিটি, ফ্লো সাইটোমিটার, ইলেকট্রো স্কয়ার পোরেটর, জিটাসাইজার ইত্যাদি। এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত কম্পিউটেশনাল এবং নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচারও আছে।

সংক্রামক এজেন্ট সংরক্ষণ ও গবেষণা করার জন্য এই ইনস্টিটিউটের বায়োসেফটি লেভেল-৩ সুযোগ-সুবিধা আছে। এসব এজেন্টের সংস্পর্শে এলে অথবা শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়। এখানে ছোট ছোট প্রাণীদের রাখার জন্য অ্যানিম্যাল হাউস আছে।

ফাঙ্কশনাল জেনোমিক্স গবেষণার জন্য এই ইনস্টিটিউটে একটি জেব্রাফিস ফ্যাসিলিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটি ক্ষুদ্রাকার মেরুদণ্ডী প্রাণী মডেল সিস্টেম হিসেবে জেব্রাফিস ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। এটি ব্যবহার করা সহজ, এর দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয় এবং বিভিন্নভাবে একে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের জেব্রাফিস, যেমন বন্য প্রকার, গোল্ডেন, ট্রান্সজেনিক এবং এর ভ্রূণ সংরক্ষণ করে রাখা আছে।

আইজিআইবি-র ৯৪টি ভারতীয় এবং ২২০টির মত বিদেশী প্যাটেন্ট আছে এবং প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা আট শতাধিক। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইজিআইবি-র যৌথ গবেষণা প্রকল্প আছে।

অধ্যাপক নিশীথকুমার পাল
শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানলেখক

প্রবন্ধ

বিবেকানন্দের পত্রাবলি

স্বদেশ ধর্ম মানবতা

ড. মারুফী খান

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে তাঁর লিখিত আত্মজীবনী অথবা পত্রাবলি একান্ত সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। পৃথিবীর বড় মাপের মানুষেরা সবাই যে এই দু'টি জিনিসের প্রতি খুব যত্নবান– তা নাও হতে পারে, ফলে সম্যক ধারণা লাভ করা অনেক সময় কঠিনই হয়ে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) সেই মহৎ ব্যক্তি যাঁকে ভাবতে গিয়ে সমুদ্রমন্থনের কথাই মনে হয়, তল বা কূল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি সম্ভবত তাঁর চিন্তাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিয়ে গেছে পথ-নির্দেশনার খোরাক। যতই পড়া হয়, ততই অত্যাশ্চর্য বিবেকানন্দ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। ভাবতে অবাকই হতে হয়– এত অল্প বয়সে এমন চিন্তা কি অসামান্য নয়? ভারতবর্ষের দুঃখপীড়িত, দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষের জন্য এক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর যে কত প্রচেষ্টা– সে কি মুণ্ডিতমস্তক, ছিন্নবস্ত্র আর আহারহীন সাধুর বিষয় হয়ে উঠতে পারে?

স্বামীজীকে সম্পূর্ণ মন উজাড় করে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, এই জন্য যে এক আবেগমথিত হৃদয়, আর্তের সেবায় উন্মুখ, নিজের মুক্তির জন্য যার পরোয়া নেই, বরং 'একজন ভারতবাসীও যতদিন অভুক্ত থাকিবে আমার মুক্তি নাই'– এই চিন্তা যিনি করেন, তিনি মানুষ নন, মহামানব। তিনি বললেন, 'কর্ম, কর্ম,– জীবন জীবন– মতে-ফতে এসে যায় কী? ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলা মুলো– এসব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম; পরোপকারই সর্বজনীন মহাব্রত– আবালবৃদ্ধবণিতা, আচণ্ডাল, আপশু সকলেই এই ধর্ম বুঝিতে পারে।' [আলমোড়া, ১০ জুলাই, ১৮৯৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এ ধরনের সরাসরি কথন নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। যে-দেশে যে-কালে ঈশ্বরবাদের জয়ডঙ্কা তুমুল শব্দে ধ্বনিত, সেইকালে স্বামীজীর এমন চিন্তা আমাদের এক দুর্জয় শক্তির যোগান দেয়। আশ্চর্য হতে হয়, এক মধ্যবয়সী সন্ন্যাসী কি অবলীলায় কর্মের মধ্যে ধর্মের মূল স্রোতকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর নামে নয়, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালবাসার মধ্যে ঈশ্বর উপস্থিত। এত সহজ কথা তিনি বললেন, কারণ তিনি যে গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যলাভে ধন্য। নিরক্ষর এক ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামীজীর উপলব্ধির দরজা খুলে দিয়েছেন পরম মমতায়, চরম উৎকর্ষে, বোধের সর্বোৎকৃষ্ট অনুভবে– সেবাই ধর্ম, পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই অধর্ম।

সন্ন্যাসী পরিব্রাজক স্বদেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করে কেবলই চিন্তায় চিন্তায় ব্যস্ত রইলেন দেশমাতৃকার কল্যাণে। শরীরের রোগ-শোক তুচ্ছ করে রাতের পর রাত কত না বক্তৃতা তৈরি করলেন প্রকৃত ধর্মকে সহজ সরল ভাষায় বিদেশীদের বোধগম্যের জন্য। নিজেকে বা নিজের রোগ নিয়ে কৌতুক, সে-ও বড় বিস্ময়ের বিষয়! বললেন,

'যেমন তুমি আমাকে কলায়ের দাল খেতে দিতে না– Strach বলে!! আবার কি খবর– না, ভাত আর রুটি ভেজে খেলে আর Strach (শ্বেতসার) থাকে না!! অদ্ভুত বিদ্যে বাবা!! রাত্রির খাওয়াটা মনে করছি খুব Light (লঘু) করব; সকালে আর দুপুরবেলা খুব খাব, রাত্রে দুধ ফল ইত্যাদি, তাই তো ওৎ করে ফলের বাগানে পড়ে আছি, হে কর্তা!!' অন্যত্র বলছেন. 'আমি লখনৌ-এ একটি বরফির ষোলভাগের এক ভাগ খেয়েছিলাম, আর যোগেনের মতে ঐ হচ্ছে আমার আলমোড়ার অসুখের কারণ।' [আলমোড়া,

২৯ মে, ১৮৯৭]

এই রসবোধ থেকে যখন স্বামীজীকে দেশমাতৃকার জনগণ সম্পর্কে ভাবিত হতে দেখি– বুঝি এমনটাই হওয়া সঙ্গত। কারণ জীবনের মুহূর্তমাত্র নষ্ট করার সময় না স্বামীজী গ্রহণ করেছেন না প্রকৃতি তাঁকে দিয়েছে।

একদিকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রভাবে ভারতবর্ষে এক নতুন জোয়ারের প্রবেশ, সমাজকে নতুন মাত্রায় স্থাপন করার এক রীতিমত যুদ্ধ। কুসংস্কার, অশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দিলে দেখা যায় ১৮৭৬ সালে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সহযোগিতায় তারই পরবর্তী প্রকাশ ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বোম্বাইয়ে এবং কলকাতায় নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন!

'বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে বাদ দিয়ে যুক্তির ওপর শাস্ত্র সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতিকে দাঁড় করবার চেষ্টা করলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে জনচিত্তে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম একটি সমন্বয়ী সত্তা লাভ করল।' [ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪১৯]

বিবেকানন্দ সমাজ সংস্কারক না কি ধর্মকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত এক মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী, সেটি চিন্তা করলে অনায়াসে মেনে নিতে হয় যে, ধর্মের কঠিন ব্যাখ্যাকে সহজ করে তিনি এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ 'বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্ত' করার কাজটি করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন বাঙালি বা ভারতবাসীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্বোপরি অভিন্ন মানবতাবোধ কতটা জরুরি। ১৮৯৭ সালের ৬ এপ্রিল দার্জিলিং থেকে তিনি লিখছেন,

'ভালমন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে। কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্যদিকে অস্থির ধৈর্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক! কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদদলিত চির-বুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাস, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শতশত মহাপ্রাণ নরনারীসকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।'

যোগী, ধ্যানী, পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আপন হৃদ্‌আলোতে অনুভব করেছেন স্বদেশ স্বদেশ করে যাঁরা মুখে রক্ত তুলছেন, তাঁদের মধ্যেও হীনমন্যতা, পরস্পর আক্রমণাত্মক হিংসা কি বিপুল বেগে কাজ করছে। সমাজের মঙ্গল কামনা করতে হলে সর্বাগ্রে চাই আত্মোপলব্ধি। নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে যখন ঈশ্বরভক্তি সংযুক্ত হয় এবং সেই ভক্তি থেকে কর্মের উদ্দীপনা প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে, তখনই সমাজ নতুন এবং সঠিক নির্দেশনায় অগ্রসর হতে পারে। মানুষ আগে মানুষ, তারপর তার ধর্মীয় বিশ্বাস। এ দুয়ের সম্মেলন থেকে যে বিচ্যুত নয়– তার দ্বারাই জগৎকে, সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব যথাযথভাবে। ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত মুচি মেথর ডোম চণ্ডালকে একই সারিতে এনে দাঁড় করাবার চেষ্টা এক মহৎ চেষ্টা শুধু নয় বরং একশো বছর আগে এক তরুণকে কিংবদন্তির নায়ক করেছিল– আজ এতদিন পরে তার মূল্যায়ন হচ্ছে। ১৮৯৫ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি লিখছেন,

'....অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজন আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের ধর্ম। The poor, the downtrodden, the ignorant, let these be your God.'

অন্যত্র একই প্রাপককে লিখছেন, 'কলিকাতার মিটিং-এর খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে ঐ famine-এতে (দুর্ভিক্ষে) পাঠাও বা কলিকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য কর– হল্‌-ফল্‌ ঘোড়ার ডিম থাক... দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়, লেকচার, বই, ফিলসফি– সব তার নীচে। শশীকে ঐ রকম একটা কর্মবিভাগ গরীবদের সাহায্যের জন্য করতে লিখবে। আর ঠাকুর পুজো-ফুজোতে যেন টাকাকড়ি বেশি ব্যয় না করে। শুধু জল-তুলসীর পুজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে– তা হলে সব কল্যাণ হবে।' [আলমোড়া, ১০ জুলাই, ১৮৯৭]

অন্যত্র স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখছেন, 'শরীর তো যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than rust out (মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলবে, তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে– এর কমে হবেই না।... টাকা ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই– যত পাবে ততই ভাল।... এই তো ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মানুষ নাই– কি কাজ করলে বলো?' [৩০ জুলাই, ১৮৯৭]

কাজ– সে দেবতার কর্ম নয়, একে মানুষকেই সম্পাদন করতে হবে, এই দৃঢ় সংকল্পকে স্বামীজী সকলের জীবনের ধ্যানে-জ্ঞানে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ধর্ম কল্যাণের জন্য, মানবমুক্তির জন্য আবির্ভূত হয়েছে কালে কালে, কিন্তু আবদ্ধ জীবের জন্য সত্য, সুন্দর ও কর্মের সমন্বয় মহামানবেরা স্ব স্ব ধর্মে স্থিত হয়ে জানাতে চাইলেও জীবের চৈতন্যের ঘরের শিকল ওঠানোই থেকে গেছে, ফলে মণি-কাঞ্চন ভোগ লোভ-লালসা পরশ্রীকাতরতায় ধর্মের মূল সৌন্দর্য আর মানুষ দেখে উঠতে পারেনি। ভেদ-বুদ্ধির কুসংস্কারের কুয়াশা সে-কারণেই কাটেনি মানবমনের। অনুবাদ নয়, মূল সংস্কৃত থেকে ধর্মীয় শাস্ত্রকে মন্থন করে স্বামীজী এই সত্যেই উপনীত হয়েছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখছেন,

'জলপ্লাবন হলেও মৃত্তিকার তারতম্যানুসারে বিভিন্ন গুণের ও বিভিন্ন ধর্মের জল দেখতে পাওয়া যায়। কৌশলী ব্রাহ্মণও সেরূপ জ্ঞানের শতধারা প্লাবিত 'বেদ' নামে খ্যাত বিরাট শব্দসমুদ্র হতে সেই অংশটুকু আহরণ করবেন, যাতে সংসারের দারুণ তৃষ্ণা দূর হয় এবং যা মুক্তি দান করবার শক্তি ধারণ করে। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই তা করতে সক্ষম। [আলমোড়া, ১ জুন, ১৮৯৭]

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই পারে ঈশ্বর এবং আত্মস্বরূপকে অনুভব করতে। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই কর্মে উদ্যোগী হওয়া এবং এই জ্ঞান দ্বারাই কর্মের ফলকে ফলিয়ে জনকল্যাণে দান করে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। আবদ্ধ জীবের এই বোধোদয় থেকেই কর্মের যাত্রা এবং মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া। শ্রী প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজী লিখছেন,

'মনে মনে অভেদবুদ্ধি, আর বাহিরে পিশাচ-নৃত্য, অত্যাচার উৎপীড়ন– গরীবের যম, আর চণ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্মের রক্ষক!... আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি সব পাগলামো– নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা 'আমার মুক্তি' 'আমার মুক্তি' করে দিনরাত মাথা ঘামায়, তাহারা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।' [আলমোড়া, ৩০ মে, ১৮৯৭]

অন্যের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে বলার যে তীব্রতা এটি বিবেকানন্দ জানিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন শুধুমাত্র কথার কথা নয়, অন্যের জন্য জীবনবাজি রাখাই ধর্ম। আত্মমুক্তি তখনই হবে যখন পরের হিতসাধনে ব্রতী হওয়া যাবে। মূলত ধর্মের প্রকৃত সারসত্ত্বকে উন্মোচন করার এই সাহসিকতা বিবেকানন্দকে শুধু সমকালের কাছেই নয় বরং ভাবীকালের কাছেও অনুসরণীয় করেছে। তাঁর ভক্ত মিস মেরি হেলকে স্বামীজী লিখছেন, 'আমি যতটুকু কাজ করেছি, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি কখনও কোন জিনিস মতলব করে করিনি।... কেবল একটা ভাব আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল– ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা আক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবা-শুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে।... আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের

প্রার্থনা কখনও করিনি। আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়ে গেছে, আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমবো।' [আলমোড়া, ৯ জুলাই, ১৮৯৭]

স্বামীজীর এই সহজ সরল বক্তব্যেই পরিলক্ষিত হয় ভারতবাসী তথা স্বদেশ কি অর্থে তার জীবনে ধরা দিয়েছে। আত্মমুক্তি যে পরার্থে কল্যাণের মধ্য থেকেই সাধিত– সেটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ধরনের পত্র থেকে। পত্র শুধুমাত্র পত্র থাকে না যখন কোন ব্যক্তিত্বের চিন্তা, চেতনা, ভাবনা, দর্শন সেখানে জায়গা করে নেয়।

আত্মজীবনী লিখতে গেলে যেমন সত্যের ভরা কলস থেকে জল আহরণ করতে হয়, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তিকে যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার পত্র অনেকখানি সাহায্য করে। পত্রতো মনের দর্পণ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার যেমন পরিবর্তন হয় তেমনিভাবে নিজস্ব বিশ্বাসের কাঠামোটিও পরিবর্তিত হতে পারে; কিন্তু এটি লক্ষ্যণীয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের অসংখ্য পত্রে নানাবিধ তথ্য, তত্ত্ব এমনভাবে এসেছে যে এক ধরনের সত্য অন্বেষণ পাঠক সব সময় করেই যান, সেটি হচ্ছে দর্শনের এই ছাত্রটি পৃথিবী, মানবতা এবং দেশ তথা ধর্মকে কোন্ মতে ধারণ কিংবা প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

লক্ষ্যণীয় যে, বিদেশীদের কাছে লিখিত পত্র এবং স্বদেশী এবং গুরুভাইদের কাছে লিখিত পত্রে প্রকারভেদ তেমন নেই। দেশের জন্য কি করতে হবে, অথবা তিনি কি ভাবকে বিশ্বাসে জারিত করেছেন– এ জাতীয় কথা যেখানে স্বজাতির কাছে ব্যাখ্যা করছেন, তখন বিদেশীদের কাছে লিখিত পত্রগুলি অনেকটাই একই বার্তা বহন করেছে। 'শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী খসখসে জেলি মাছের মত ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করব– একেবারে সম্পূর্ণ নূতন সরল অথচ সবল– সদ্যোজাত শিশুর মত নবীন ও সতেজ।' [লন্ডন, মে, ১৮৯৬]

এবং মিস মার্গারেট নোবেল (পরবর্তীকালের ভগিনী নিবেদিতা) লিখছেন,

'জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মত শক্তিশালী করে তুলবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে– তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে; এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে।' [লন্ডন, ৭ জুন, ১৮৯৬]

এই আহ্বানই হচ্ছে ভারতবর্ষের সেই অশ্রুতপূর্ব আহ্বান– জাগো, ওঠো। ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলবার এই মহাপ্রয়াসের মহানায়ক বিবেকানন্দ তাঁর স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন আবালবৃদ্ধবণিতাকে। মাত্র উনচল্লিশ বছরের আয়ুষ্কাল একটি নিদ্রিত, পদদলিত, বঞ্চিত জাতিকে শুধু ঘুম ভাঙিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং টেনে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নয়, দৌড়ের পাল্লায় প্রতিযোগী করে তুলেছে। বিবেকানন্দ তাঁর কালে এবং এই কালে– বস্তুত সর্বকালের এক উদাত্তকণ্ঠ বীর যোদ্ধা, তাঁর বাণীতে শক্তি, জীবনাচরণে ভক্তি এবং দারিদ্র্য-পীড়িত দেশ মাতৃকার জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী। তিনি গেরুয়াধারী কিন্তু কুসংস্কার বিহীন, তিনি মুন্ডিত মস্তক যোগী সন্ন্যাসী কিন্তু সর্বধর্মের প্রতি অনুরাগী, তিনি নিজ কালের এবং সর্বকালের।

ড. মারুফা খান
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ জা নু য়া রি

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

০১ জানুয়ারি ১৮৯০ ❖ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৮৯৪ ❖ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯১৪ ❖ অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯০৩ ❖ জসীমউদ্‌দীনের জন্ম
০২ জানুয়ারি ১৯১৭ ❖ শওকত ওসমানের জন্ম
০৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু
০৮ জানুয়ারি ১৯০৯ ❖ আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম
১০ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ ❖ মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি
১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ ❖ মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯০১ ❖ সুকুমার সেনের জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ ❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯০৫ ❖ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯৩৫ ❖ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ ❖ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম
২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তর জন্ম
২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ প্রজাতন্ত্র দিবস
২৯ জানুয়ারি ১৯৭৬ ❖ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মৃত্যু
৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ ❖ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম
৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ ❖ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ॥ শহীদ দিবস

প্রবন্ধ

যেভাবে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু হয়ে উঠলেন

এম দত্ত

উনিশশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আলবার্ট আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চার পৃষ্ঠার একটি রচনা নোটসহ ইংরেজি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। সেদিন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু একজন মহান বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বের সামনে উঠে আসেন। ঐ রচনায় ফোটনের বণ্টন রীতি আলোচিত হয়, যা বোসন পরিসংখ্যান নামে সমধিক পরিচিত। এই বণ্টন পদ্ধতি আইনস্টাইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। আণবিক গবেষণায় বসুর তত্ত্ব প্রয়োগ এবং দৃষ্টিভঙ্গিও বোসন পরিসংখ্যান নামে পরিচিতি লাভ করে অনেক পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে। অবশ্য অনেকের কাছে এটি 'বোস-আইনস্টাইন থিওরি' নামেও পরিচিত। বোসন পদ্ধতি মেনে চলা কণাকে 'বোসন কণা' বলা হয়। অনুরূপ বোসনতত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 'পাউলির বর্জন নীতি' থেকে ফার্মি প্রণীত 'ফার্মি তত্ত্ব' মেনে চলা কণা 'ফার্মিওন' নামে পরিচিত।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে এটা সর্বজনবিদিত যে, একটি কণা হয়তো বোসন অথবা ফার্মিওন। এভাবে অধ্যাপক বসু পদার্থবিজ্ঞানের উন্নয়নের গবেষণায় স্থায়ী আসন সৃষ্টি করে নেন। তা ছাড়া তিনি ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র এবং গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদান রাখায় তাঁকে অসাধারণ পণ্ডিত বলে বিবেচনা করা হয়।

অধ্যাপক বসুর গভীর অনুরাগ ছিল সাহিত্যের প্রতি। তিনি শুধু চিরায়ত বাংলা, সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান সাহিত্যেরই মনোযোগী পাঠক ছিলেন না, তিনি ঐসব ভাষার– বিশেষ করে বাংলা এবং ফ্রেঞ্চ সাহিত্যের সদ্য প্রকাশিত বইয়ের ব্যাপারেও খোঁজখবর রাখতেন। তিনি *সবুজ পত্র* ও *পরিচয়* নামে দু'টি বিখ্যাত মাসিক সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাহিত্যগোষ্ঠীর সদস্যও ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে পত্রিকা দুটির অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষণ, অভিভাষণ ও বাংলা রচনা সাহিত্যরসে পূর্ণ ও বাক-বৈদগ্ধে সমৃদ্ধ। সুধিসমাজ আয়োজিত প্রয়াত অধ্যাপক বসুর স্মরণসভায় তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানান, 'অধ্যাপক সত্যেন বসু ছিলেন একজন বিরল প্রতিভা। তিনি অতি সহজেই গণিতের নানা সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারতেন।'

আমার মনে হয় নানা বিষয়ের ওপর সত্যেন বসুর ছিল জন্মগত প্রতিভা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর গভীর ও ব্যাপক আগ্রহ। তিনি বুদ্ধিমত্তা, স্মরণশক্তি ও আগ্রহ বৃদ্ধির ব্যাপারে চেষ্টাও করেছেন।

এমনকি স্কুলের ছাত্রাবস্থায় সত্যেন বসু শিক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর গণিতপ্রতিভা দিয়ে। তিনি শুধু পাঠ্য বইয়ের সবগুলো উদাহরণই সমাধান করতেন না বরং সমধর্মী অন্য বইয়ের গাণিতিক সমস্যাগুলোও তিনি সম্পাদন করতেন সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বন করে। তিনি যা সমাধান করেছেন সেগুলোর সম্পর্কযুক্ত সমস্যাগুলো সমাধান করা এবং সূত্রাবদ্ধ করা ছিল তাঁর আরেকটি গুণ। যাদের এসব গাণিতিক সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা আছে তারা জানেন, কাউকে পাণ্ডিত্য অর্জন করার জন্য অবশ্যই সম্ভাব্য সবরকমের সমাধানের চেষ্টা করতে হয়। এ জন্য তাদের উচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা কীভাবে এগুলো সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন পরিচিত সমস্যা থেকে চিহ্নিত করা যায়। যাতে আঘাতের পদ্ধতিটি সহজে অনুমান করা সম্ভব হয়। এটি গণিতের বিভিন্ন শাখার সমস্যা সমাধানের বিশ্বপরিচিত একটি পদ্ধতি।

ছাত্রজীবনে সত্যেন বসু কোনদিন গাণিতিকি বিশ্লেষণ করেননি। তিনি এগুলো শিখেছেন এস সি কারের কাছে। হোয়াইটেকারের কয়েক খণ্ডের বিশাল বই *মডার্ন এনালাইসিস* গ্রন্থের যে কপিগুলো তাঁর কাছে ছিল, সেগুলোর মার্জিনে তিনি অসংখ্য মন্তব্যে ভরে তুলেছেন। সেখানে তাঁর কিছু পরামর্শধর্মী মন্তব্যও ছিল যে, তিনি এ বইয়ের সবগুলো সমস্যার সমাধান করেছেন। আর প্রতিটি সম্পাদন করেছেন নানা পদ্ধতিতে।

পরবর্তী জীবনে যখনই তিনি কোন উচ্চতর গণিত, গাণিতিক পদার্থ-বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন তখনই তিনি সমস্যার গভীরে কয়েকদিনের জন্য ডুবে যেতেন। কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের জন্যও এমন হত। যখন বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে তিনি কয়েকটি উপায়ে সমাধান করতে পারতেন, যখন সন্তুষ্টি লাভ করতেন তখন তিনি চিন্তাস্রোত থামাতেন এবং কাজ বন্ধ করতেন। না হলে তা চলতেই থাকত। এ ধরনের চর্চার ফলে তিনি গাণিতিক সূত্র শেখার এক নতুন উদ্ভাবনকুশল অনুষদ উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হন। মৌলিক সূত্রের সাহায্যেই তিনি এটা করতেন। এই মৌলিক সূত্র থেকেই তিনি মাঝে মাঝে সব কিছু খুঁটিনাটি হিসাব করতেন বই বা কোন জার্নালের সাহায্য ছাড়াই। এটা তাকে প্রবল আত্মবিশ্বাস এনে দেয়– যা কিছু তিনি সমাধান করেছেন তা তিনি করেছেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। সত্যিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি সমস্যাগুলো সমাধান করেছেন নিজস্ব উদ্ভাবনী পন্থায়। কখনো করেছেন সোজাসুজি কিন্তু দীর্ঘ সময় নিয়ে। এটা বলা হয়ে থাকে যে পরিণত বয়সে প্রখ্যাত গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট এই পন্থা অবলম্বন করতেন। *নোটস অন কোয়ান্টাম মেকানিকস* বইয়ের ভূমিকায় জানা যায় ফার্মিও একই পন্থায় কাজ করতেন।

যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক তখন তাকে এক বা একাধিক সমস্যার সমাধান নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত। কখনো সন্নিহিত গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান অথবা গণিত, কখনো পদার্থবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কখনো রসায়নের বিষয় নিয়েও তিনি এভাবে গভীরভাবে ডুবে থাকতেন। এ সময় এক্সরে গবেষণাগার এবং রাসায়নিক গবেষণাগার তার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। তার ছাত্র-ছাত্রী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানান যে, সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে খুব কম সময়ই গণিত বা বিজ্ঞানচিন্তামুক্ত হয়ে থাকতে দেখা যেত। এমনকি পরপর কয়েকটি দিনও এমন অবসর তাঁর দেখা যেত না। যদি কখনো কয়েকদিনের জন্য এমন অবসর ঘটেই থাকে, তখন তিনি বন্ধু বা সহযোগীরা যে সব কাজ করেছেন সেগুলোর সমস্যা নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতেন।

একটি কঠিন সমস্যার সমাধান শেষ করার পরে আরেকটি সমস্যায় ডুব দেওয়ার মাঝখানের সময়ে তাকে হালকা কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত। এ সময় যে কোন বয়সের, যে কোন পদমর্যাদার যে কোন লোক তার সঙ্গে মুক্তভাবে কথা বলার সুযোগ পেতেন। তার কাছের লোকদের অনুযোগ যে, এ সময় তাকে বেশ অলস এবং হালকা বিষয় নিয়ে আড্ডা দিতে দেখা যেত। কিন্তু তার সহযোগী-সহকর্মী এবং শিক্ষার্থীরা জানেন যে, তিনি যখন কাজে ডুবে যেতেন তখন তার সঙ্গে অন্য কোন বিষয়ে পাঁচ মিনিট কথা বলাও খুবই কঠিন ছিল। এ সময় তিনি যা বলেন তাদের শুধু তাই শুনতে হত, যেন তিনি উচ্চ স্বরে চিন্তা করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গভীর ভাবনা ও অধ্যবসায় ছিল বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে। তার শিক্ষার্থী ও সহযোগীরা মুগ্ধ হয়ে নোট করতেন, যে সব বিষয়ের প্রতি একজন শিক্ষক এবং গবেষক হিসেবে তাদের গবেষণার আগ্রহ জন্মানোর জন্য তিনি উদাহরণ দিতেন সে সব বিষয়ের সঙ্গে তার উল্লেখ-উদ্ধৃতি, বিজ্ঞানের উন্নতির বর্ণনার কোন সংযোগ বা সম্পর্ক থাকত না।

সত্যেন্দ্রনাথের ধারে-কাছে যারা যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তারা তার সাহিত্যপ্রীতির কথা জানেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করছিলেন। তার একজন সহযোগীকে তিনি বোঝালেন, 'আমি সংস্কৃত ভাষায় বাল্মীকির মূল রামায়ণ পাঠ করছি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, কৃত্তিবাসের অনুবাদ রামায়ণের সঙ্গে এর পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করার জন্যে।' প্রায়ই তাঁকে দেখা যেত সদ্য প্রকাশিত ফরাসি বইয়ের মধ্যে গভীর অভিনিবেশে নিমজ্জিত থাকতে। স্কুল বয়সের বন্ধু প্রয়াত অধ্যাপক নীরেন রায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* উপন্যাসটি যখন একটি বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন অধ্যাপক বসু, আমি এবং কয়েকজন বন্ধু কিস্তিগুলো প্রতি মাসে সতর্কভাবে পড়তাম, পরে আমরা বিশ্লেষণ করতাম এবং পরের কিস্তিতে কী ঘটবে তার পূর্বধারণা করতাম। আমাদের প্রত্যেকের পূর্বধারণাগুলো কাগজে লিখে রাখতাম। পরের মাসে পত্রিকাটি বের হলে উপন্যাসটির পরের কিস্তি পড়ার সময় মিলিয়ে দেখতাম আমাদের ধারণামত উপন্যাসটির উন্নতি ঘটছে কিনা। এভাবে আমরা তখন উপন্যাস পড়তাম।' এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় অধ্যাপক বসু বিজ্ঞান গবেষণায় যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন সাহিত্যেও সেই পদ্ধতির ব্যবহার করতেন। এটি যে কোন বিষয়ে জ্ঞানের সাধারণ স্তর থেকে স্বাধীনভাবে উন্নতি করার একটি পদ্ধতি। এতে নিজের পূর্বধারণাগুলো অন্যদের পূর্বধারণা এবং বিষয়ের ক্রমোন্নতি মিলিয়ে দেখার সুযোগ ঘটে।

অধ্যাপক বসু একজন ভাল সংগীতবিদও ছিলেন। উচ্চমানের সংগীত শোনার জন্য কৈশোর-তারুণ্য থেকেই তিনি রাতের পর রাত জাগতে পারতেন। মাইলের পর মাইল হেঁটে দূরে যেতে কোন দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি এসরাজ ভাল বাজাতে পারতেন। তিনি রাতে সবার আগে ঘুমাতে যেতেন, উঠতেনও সবার আগে। অনেক সময় তিনি ভোর রাত, এমনকি রাত দুইটা-তিনটার সময় উঠতেন। যখন তিনি কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকতেন তখন সাধারণত দুইটা-আড়াইটার সময় উঠে যেতেন। অন্য সময় দুইটার দিকে উঠে এসরাজ বাজাতেন। যখন তিনি ঢাকায় থাকতেন, তাঁর এই অভ্যাস ছিল। অনেক সময় তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে সংগীতের সুর নিয়ে গবেষণা করতেন। নতুন করে তিনি সুর সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতেন। তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে শেখার চেষ্টা করতেন, যেমন স্বভাব ছিল তার গবেষণা ক্ষেত্রে।

এটা অস্বীকার করা যাবে না যে অধ্যাপক বসু ছিলেন ভীষণ মেজাজি, ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং স্পষ্টত শৃঙ্খলাহীন; এমনকি বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণায়ও। যারা তাঁকে একটু দূর থেকে দেখতেন শুধু তারাই না, কাছ থেকে দেখেছেন, এমনকি তার সহযোগীরাও অভিযোগ করতেন যে, তিনি অলস, হালকা বিষয়ে আড্ডায় মেতে ওঠেন, এমনকি কিছুই না করে সময় অপচয় করেন। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হয়েও তিনি এমনভাবে সময় কাটান, তাঁর কিছু করা উচিত। তবে প্রত্যেকর কাজ, সাধনা এবং গবেষণা তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই চলে। এটা তার গভীর অনুধ্যান থেকে দেখা যায়। অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, মাতৃভূমির প্রতি অগাধ প্রেম তাঁকে রুচিশীল, স্বকীয় মানসিক সামর্থ্যবান করে তুলেছে এবং তাঁকে দৃঢ় কিন্তু কোমল সৌহার্দপূর্ণ ব্যক্তি এবং অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলেছে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন জন্মগত প্রতিভা কিন্তু তাঁর কঠোর পরিশ্রম, সাধনা ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তাঁকে বানিয়েছে যা তিনি আমাদের কাছে পরিচিত। এভাবে তিনি একজন মানুষ হয়ে, হয়ে ওঠেন মহানবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সংগীতবিদ এবং নানা গুণের অধিকারী।

অনুবাদ কাজী মহম্মদ আশরাফ

প্রবন্ধ

জ্যোতির্ময়ী বিদ্যাদেবী

সরস্বতীরানী পাল

সরস্বতী বিদ্যার প্রধান অধিষ্ঠাত্রীদেবী। হিন্দুশাস্ত্রে, বৈদিক জ্যোতিরূপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতী সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের দেবতারূপে পুরাণ, তন্ত্র ও সাহিত্যে বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারিণী। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির বেড়া ডিঙিয়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মেও পূজার আসনে অধিষ্ঠাতা হয়েছেন। বিদ্যাদেবী সরস্বতী সম্পর্কে জৈনদের একটি পৌরাণিক কাহিনি এরকম–

জম্বুদ্বীপের প্রান্তভাগের সঙ্গে অন্যান্য দ্বীপের বিভেদ করার জন্য হিমবান্ পর্বতের সৃষ্টি। সেই পর্বতে সাতটি হ্রদ আছে, সেগুলি খুব বড়। হ্রদগুলি থেকে অনবরত জল বের হয়। সেই জল নীচে এসে পড়ে নদীতে পরিণত হয়। এই সব হ্রদে এক-একটি কমল আছে। ঐ সব কমলের উপর এক-একটি মহল আছে। প্রত্যেক মহলে একজন দেবী আছেন। এঁরাই শাসনদেবী। এই শাসন-দেবীদের পূজারও ব্যবস্থা ছিল। ক্রমশ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন সম্প্রদায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ্য-দেবতাকে নিজেদের ধর্মে স্থান দিলেন। প্রাচীনকাল থেকে জৈনরা সরস্বতীকে গীর্বাণী বাগ্ দেবতারূপে আরাধনা করে আসছেন। তাই সরস্বতী তাঁদের মধ্যে প্রধান দেবী। জৈনদের মতে, ভগবানের মুখ-নির্গতা বাণীই শ্রুত এবং শ্রুত ও সরস্বতী অভিন্ন। সরস্বতীকে এঁরা শ্রুত বা বিদ্যার অধিকারিণী 'শ্রুতদেবী' বলে অভিহিত করেন। জৈনরা সরস্বতীকে শাসন-দেবীরূপে শ্রদ্ধা করে থাকেন। তাই জৈনমন্দিরে ও জৈন গৃহস্থের বাড়িতে সরস্বতী-মূর্তি প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। শাসনদেবীগণ তীর্থঙ্কর ও কেবলীদের জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী এবং তাদের শাসনভার বহন করে থাকেন। এঁদের মধ্যে বিদ্যাদেবীরূপে ষোলজন শাসনদেবীর পূজারও ব্যবস্থা করা হয়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনরা জ্ঞানপঞ্চমী বা শ্রুতপঞ্চমীতে সারস্বত উৎসব করে থাকেন। কার্তিকী শুক্লা পঞ্চমী জৈনদের 'জ্ঞানপঞ্চমী'। এই তিথিতে সারস্বত উৎসবে জৈনরা বিদ্যাদেবীর পূজা করেন। ষোলটি বিদ্যাদেবীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রুতিদেবীই প্রকৃত জৈন সরস্বতী। ইনি ব্রাহ্মণীর প্রতিরূপ। বিদ্যাদেবীর বিদ্যাসম্পর্কিত নানা ব্যাপার এঁদেরই সাহায্যে ইনি সম্পাদন করে থাকেন (Iconography of the Hindus, Buddhists and Jainas, S R Gupta, page 176)।

হেমচন্দ্র আচার্য তাঁর *অভিধান চিন্তামণি*তে (দ্বিতীয় পর্যায়, ৯৩) ষোড়শ বিদ্যাদেবীর নামোল্লেখ করেছেন–

রোহিণী প্রজ্ঞপ্তী বজ্রশৃঙ্খলা কুলিশাঙ্কুশা
চক্রেশ্বরী নরদত্তা কাল্যথাসৌ মহাপরা ॥
গৌরী গান্ধারী সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা চ মানবী।
বৈরাট্যাচ্ছুপ্তা মানসী মহামানসিকেতি তাঃ॥

সুতরাং, শ্বেতাম্বরদের মতে ষোড়শ বিদ্যাদেবী বলতে রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তী, বজ্রশৃঙ্খলা, কুলিশাঙ্কুশা, চক্রেশ্বরী, নরদত্তা, কালী, মহাকালী, গৌরী, গান্ধারী, জ্বালা, মানবী, বৈরাট্যা, অচ্ছুপ্তা, মানসী ও মহামানসী।

প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে, ব্রাহ্মণগ্রন্থে সরস্বতী পুরাপুরি বাগ্দেবী। এরপর পৌরাণিক যুগে বাগ্দেবী সরস্বতী রীতিমত পূজিত হতে লাগলেন। সরস্বতী বাগীশ্বরী। বৌদ্ধদের মঞ্জুশ্রী বিদ্যার অধিষ্ঠাতা হিসাবে বাগীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। বিদ্যাদেবী মঞ্জুশ্রী

সকল বিদ্যার অধিকর্ত্রী– 'এতেষাং সর্ববিদ্যানাং মঞ্জুশ্রীরিব সংস্থিতঃ' (সয়ম্ভূপুরাণ, ৬ অঃ এসিঃ সো সং-পৃ. ৩৪৫)। বাগীশ্বরের শক্তি হিসেবে বাগীশ্বরীর উপাসনা ও বিচিত্র রূপকল্পনা প্রচলিত। তাই হিন্দুতান্ত্রিকেরা বাগীশ্বরী নামে সরস্বতীর আরাধনা আর বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা বাগীশ্বর-শক্তি বাগীশ্বরীর ভক্ত হয়ে বাগীশ্বরী নামে সরস্বতীর পূজা শুরু করেন।

পুরাণে ও আধুনিককালে সরস্বতী বাক্য বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীরূপে প্রসিদ্ধা। বৈদিক সরস্বতীর অন্য পরিচয় পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি কেবলমাত্র বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। বৈদিক সরস্বতী বাগাধিষ্ঠাত্রী বা বাগ্দেবীরূপেও বর্ণিতা হয়েছেন।

আদিকাব্য রামায়ণে বাণী-সরস্বতী বাগ্দেবতা। বাক্ ও সরস্বতীর অভিন্নতা ব্রাহ্মণগুলিতে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে। ব্রাহ্মণে স্পষ্টভাবেই সরস্বতীকে বাক্ বা বাক্যদেবী বলা হয়েছে– 'বাগৈ সরস্বতী বাচমেব তৎ প্রীণাতি' (সাংখ্যায়ন ব্রাঃ ৫ম অঃ)। 'বাগৈ সরস্বতী বাগৈ রূপ্য বৈরূপমেবাস্মে তথা যুনক্তি'। অর্থাৎ– বাক্যই সরস্বতী বাক্স্বরূপ এবং বিরূপ তাতে সংযুক্ত করেন। বাক্ বা সরস্বতী এখানে রূপস্রষ্টী। সূর্যের আলোকেই স্বরূপ এবং কুরূপ প্রকাশ পায়। প্রজাপতি বাকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বাক্কে দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ অর্থাৎ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন। 'মহো অর্থঃ সরস্বতী' ইত্যাদি ঋক্-এর (১/৩/১২) ভাষ্যে যাস্ক বলেছেন, 'বাগর্থেষু বিধীয়তে তস্মান্নাধ্যমিকাং বাচং মন্যন্তে'। অর্থাৎ, বাগর্থের দেবতা সরস্বতীকে মাধ্যমিক বাক্ (মধ্যস্থানবর্তিনী– জ্যোতিস্বরূপা) বলা হয়।

সরস্বতীর বাক্যাধিষ্ঠাতৃত্ব বা বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্ব ঋগ্বেদেই দৃষ্ট হয়। জ্যোতিরূপা নদীরূপা সরস্বতী বাগ্দেবী বা বিদ্যাদেবী হলেন কিভাবে– 'চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্' (ঋগ্বেদ-১/৩/১১)। অর্থাৎ– সুনৃত (সত্য) বাক্যের উৎপাদনদয়িত্রী, সুমতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্ঞানদাত্রী। 'ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি' (ঋগ্বেদ-১/৩/১২) অর্থাৎ– (সরস্বতী) সকল জ্ঞান উদ্দীপ্ত করেন। তিনি জ্ঞানীদের দ্বারা স্তুত হন– 'উপস্তুত্যাচিকিতুষা সরস্বতী'।

শ্রীশঙ্করনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'ঋগ্বেদে সরস্বান্ শব্দের অর্থ সূর্য। আর সরস্ শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ। সরস্ + বতী = সরস্বতী। সরস্বতী শব্দের আসল অর্থ জ্যোতির্ময়ী। তাই তাঁর জ্যোতিঃ শুভ্র। সরস্বতী সাধনা জ্যোতিরই সাধনা। এখানে সূর্য স্ত্রী আকারে প্রকাশমান। মাতৃভাব তাঁর। সরস্বান সূর্য। স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী। গত্যর্থক সৃ ধাতুর সঙ্গে অসুন্ প্রত্যয় যোগে সরস্ শব্দ নিষ্পন্ন। সরস্ শব্দের অর্থ গতিশীল সূর্যরশ্মি– গতিশীল ত্রিলোকব্যাপী রশ্মি যার আছে এই অর্থে সরস্ শব্দের উত্তর-মতুপ্ প্রত্যয় করলে সরস্বান্ শব্দ হয়। সরস্বৎ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করলে হয় 'সরস্বতী'। সুতরাং গতিশীল তেজোরূপ সূর্যকিরণ সরস্বান্ এবং স্ত্রীরূপ সরস্বতী সূর্যাগ্নির দীপ্তি বা জ্যোতি।

ব্রহ্মা সৃষ্টির অধীশ্বর হলেন এবং তাঁর অচ্ছেদ্য শক্তি সরস্বতী তাঁর মুখে বসতি করলেন। তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই আবার সৃষ্টির আদিকারণগণ বাক্ বা শব্দবৃহ্ম (logos)। অপর দিক দিয়ে দেখলে তিনিই হয়ে দাঁড়ান– 'বাগ্ বৈ ব্রহ্মা'। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে কাকতীয়রাজ গণপতিদেবের গরবপদু লিপিতে (Garabapadu Grant) সরস্বতীকে 'সারস্বত' অর্থাৎ সূর্যাগ্নির তেজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে– তেজস্ সারস্বতাখ্যম্ (Epigraphia Indica, Vol, XIII, page 350)। যাস্কের মতে, সরস্বতী শব্দের অর্থ, যাতে জল আছে, সৃ ধাতু নিষ্পন্ন সর শব্দের অর্থ জল, জল আছে যাতে তাই সরস্বতী। সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণ মুহুর্মুহু রূপ পরিবর্তন করে– সেই শতরূপময়ী জ্যোতিই শতরূপা। সুতরাং সরস্বতী সূর্যাগ্নির তেজ বা জ্যোতি। ব্রাহ্মণেই প্রজাপতির (পরবর্তীকালের ব্রহ্মা) সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ লক্ষিত হয়। 'বাগ্বৈ সরস্বতী, বাচৈব তৎ প্রজাপতিঃ পুনরাত্মানমাপ্যায়য়ত বাগেনাযুপসমাবর্তত বাচমনকাম্যত্মনোহকুরুত...।' – (অস্যার্থ) বাক্যই সরস্বতী, বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত করেছিলেন। তিনি বাক্যই কামনা করেছিলেন।

সরস্বতীর বিবর্তন ইতিহাসে জানা যায়, বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা। তিনিও বাক্পতি। ইন্দ্রও বাক্পতি। সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার ও সূর্যাগ্নিরূপী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাঁদেরই শক্তি জ্যোতিরূপা সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। সরস্বতী-তীরে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, এখানেই ঋষি লাভ করেছিলেন বেদ, ঋক্মন্ত্র ঋষির কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল, সামমন্ত্র গীত হয়েছিল। সুতরাং, সরস্বতী জ্ঞানের বা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী হয়েছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃ প্রদানকালে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারিত হওয়ায় সরস্বতী হলেন বিদ্যারূপেণ বা বাগ্রূপা– জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী।

ত্রিলোক বিচরণশীলা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী প্রবহমানা জলময়ী মর্ত্য সরস্বতীতে অবতীর্ণা হলেন– জলময়ী নদী সরস্বতী জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী হওয়ায় তিনি হলেন বাগ্দেবী বা বিদ্যাদেবী। ক্রমে সরস্বতী তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র বিদ্যাদেবী– জ্ঞানবিদ্যার অধিশ্বরীতে পরিণত হলেন। পণ্ডিতরা অনেকেই মনে করেন যে, সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে হলেন দেবতা। পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষায়, 'আর্য্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে, তাহাই প্রথমে দেবী বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। আগে গঙ্গা যেরূপ হিন্দুদিগের উপস্যাদেবী প্রথম হিন্দুদিগের পক্ষে সরস্বতী নদী সেইরূপ ছিলেন। অচিরে সরস্বতী বাগ্দেবীও হলেন।'

সরস্বতীর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সূর্যাগ্নির জ্যোতিতে। সূর্যাগ্নির তেজ, তাপ ও চৈতন্যরূপে জীবদেহে বিরাজ করায় চেতনা, বোধ বা জ্ঞানের প্রকৃত বাণী তথা দিব্যসরস্বতী। দিব্যসরস্বতী মর্ত্যে নদীরূপে অবতীর্ণা এবং দিব্যসরস্বতীই অগ্নি-ইন্দ্র-মরুৎ-অশ্বিদ্বয়ের সংস্পর্শে শত্রুঘাতিনী, ধনদাত্রী এবং রোগারোগ্য বিধায়িনীরূপে মন্ত্রাধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি–ব্রাহ্মণসগতির বিদ্যাবত্তার সংযোগে নদী সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপ। সরস্বতী তীরে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পুরাণে বিদ্যা ও জ্ঞান ভিন্ন অপর গুণগুলি অন্যত্র স্থাপন করে হলেন একেশ্বরী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সর্ববিদ্যার অধিশ্বরী দেবী।

সরস্বতী বিদ্যার ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে সমগ্র ভারতে পূজিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর *সারদামঙ্গল* কাব্যে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর আবির্ভাব বর্ণনা করেছেন। আদি কবি বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চহননের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়ে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী বাল্মীকির ললাটে বিদ্যুৎরেখার মত প্রকাশিত হয়েছিলেন–

সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীলনবঘনে।
* * *
কিরণমণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিক মেয়ে ॥

জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও যজ্ঞাগ্নিরূপ সরস্বতী অভিন্ন। সহজ ভাষায়, অগ্নিরশ্মি, সূর্য তেজ ও মেঘনাদ সমন্বিতা জ্যোতির্ময়ী দেবীই সরস্বতী। উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে, সরস্ শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ। তিনি বিদ্যাদেবীর আরাধনাকে 'জ্যোতিঃ সাধনা' বলে উল্লেখ করেছেন। সেইজন্যই সরস্বান্ শব্দে সূর্যকে বোঝায়। জ্যোতির্ময়ী যে মহাসরস্বতী জ্যোতি দিয়ে ত্রিলোক উদ্ভাসিত করেন তিনি জ্যোতির্ময়ী দিব্য সরস্বতী। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–

একী এ, একী এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা।
কী প্রতিমা দেখি এ– জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁশিয়ে মা মরি কমল পুতলা ॥"

(বাল্মীকি প্রতিভা– রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৮)

'সরস্বতী নদীশ্রেষ্ঠা-দেবীশ্রেষ্ঠা-জননীশ্রেষ্ঠা-অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী।' (ঋগ্বেদ-২/৪/১/৬) আমাদের সবার আরাধ্যা বিদ্যাদেবী। সরস্বতীর আরাধনা মানে সত্য ও সুন্দরের সাধনা। পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, 'সরস্বতী সূর্যের শক্তিকেই দেবীস্বরূপ কোন কোন স্থানে অর্চনা করা হয়েছে'। এই দেবীর আরাধনায় সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়া যায়। তাই শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই নন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছেও বিদ্যাদেবী সরস্বতী পরম আরাধ্যা এবং সর্বকালের সমান জনপ্রিয় দেবী।

সরস্বতীরানী পাল
প্রাবন্ধিক, গবেষক

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ছোটগল্প

আমার না বলা বাণী

মীনাক্ষী সিংহ

টিভির ব্রেকিং নিউজ-এ খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। ভারতখ্যাত চিত্রপরিচালক সুবীর চৌধুরী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই পরিচালকের মৃত্যুতে চিত্রজগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হল, সারা দেশবাসীর কাছে তা চরম আঘাত। গত সপ্তাহে পুণের ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সমাবর্তন সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে জ্ঞান হারান তিনি। সে জ্ঞান আর ফেরেনি। টিভির পর্দায় ভেসে উঠল তাঁর সহাস্য আনন, পাশে তাঁর নায়িকা স্ত্রী ও কন্যা। পর্দায় একের পর এক ভেসে উঠল বিশিষ্ট জনদের মুখ– তাঁদের স্মৃতিচারণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে বিশিষ্ট জনদের শোকবার্তায় চোখ রাখছে অসংখ্য দর্শক, অনুরাগী ভক্তবৃন্দ, বন্ধু প্রিয় পরিজন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সুবীর চৌধুরীর নানা পুরস্কার প্রাপ্ত ছবির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। অসংখ্য পুরস্কার, সম্মাননার নানা ভঙ্গিমার নানা ছবি। পুণে থেকে মরদেহ বিশেষ বিমানে মুম্বইতে আনা হচ্ছে– ফিলমিস্তান স্টুডিও চত্বরে শায়িত থাকবে অনুরাগীদের শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য।

পরদিন প্রতিটি সংবাদপত্র জুড়ে মহান চিত্র পরিচালকের অজস্র ছবি, শিল্পকর্মের পরিচয়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা ঘটনার ছবি। প্রথম জীবনের নানা সংগ্রাম ও সংকটের মধ্য দিয়ে এক আশ্চর্য উত্তরণের কাহিনী– সুবীর চৌধুরীর বর্ণময় জীবনের ঘটনা-পরম্পরা দিয়ে সাজানো সংবাদপত্রের প্রভাতী সংস্করণ।

দূরদর্শনে হচ্ছে লাইভ টেলিকাস্ট। মুম্বইয়ের স্টুডিও চত্বর লোকে লোকারণ্য– যেন জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার। মহান পরিচালককে দেখার জন্য ভিড় জমে উঠেছে। ক্যামেরার ঝলসানিতে আলোকিত হয়ে উঠছে শবাধারে শায়িত পরিচালকের ফুলে ফুলে ঢাকা মরদেহ। তার দু'পাশে শোকবিহ্বল স্ত্রী ও কন্যা। শোকার্ত প্রিয় পরিজনেরা ঘিরে রেখেছে তাঁদের। অসংখ্য জনতার ভিড়ে মিশে আছে চলচ্চিত্র জগতের জনগণ নন্দিত নায়ক নায়িকা, রূপালি পর্দার তারকারা। দর্শকের একাংশ তাদের দেখতেই মনে হয় বেশি আগ্রহী। টিভি ক্যামেরাতেও স্টারদের ঝলক– মৃত্যুও যে এমন আলোকিত বর্ণময় শোকোচ্ছ্বাস– জনসমুদ্রের জোয়ারে তা-ই প্রমাণিত।

দুই.

কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর সাতশো স্কোয়ার ফুটের সাদামাটা ফ্ল্যাটটি একেবারে নিঃশব্দ। ভেতরের ঘরে একটি মূর্তি টিভির সামনে চিত্রার্পিতবৎ স্থির নিশ্চল। না, কোন চিত্র সাংবাদিক, চলচ্চিত্রানুরাগী মুগ্ধ দর্শক বা অভিজ্ঞ কলাকুশলী কারোর ভিড় সেখানে নেই। নিঃশব্দ, নিস্তব্দ পরিবেশে শোক যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এনেছে।

দূরদর্শনের পর্দা থেকে দৃষ্টি চলে গেল স্মৃতি দূরবীণে– অনেক দূরে চলে যাওয়া ঝাপসা ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল নির্বাক মূর্তির কাছে। মনে পড়ল বোম্বের (তখনো মুম্বই নামটা চালু হয়নি) শহরতলীর ছোট্ট এক কামরা অপরিসর, ফ্ল্যাটের সেই সংসার। স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, তবু আনন্দ ছিল। স্বপ্ন দেখা উচ্চাভিলাষী এক তরুণ তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টুডিও পাড়ায়। ছবি তৈরি তার স্বপ্ন, কিন্তু সাধ্য সীমিত, সুযোগ অনায়ত্ত। তার নববিবাহিত স্ত্রী, প্রেমিকা থেকে সদ্য সহধর্মিণী পদে উন্নীতা– স্বামীর সব কাজে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। তার সীমিত সাধ্যে পাড়ায় সেলাই আর গান শিখিয়ে সংসারকে সচল রেখেছে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা স্বামীকে কেবলই উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে চলেছে। অবশেষে একদিন ছবিতে সহকারী পরিচালনার সুযোগ এল– আর সেই সময়েই তাদের দু'জনের পরিবারে আবির্ভাব হল তৃতীয়জনের; ছোট্ট নতুন অতিথি। মেয়ের জন্মই তাদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করল।

তারপর আর পিছু ফিরতে হয়নি তরুণ পরিচালককে। এরপরই আকস্মিকভাবে স্বাধীনভাবে পরিচালনার সুযোগ এল। চলচ্চিত্র জগতে তার আসল হল পাকা।

এরপর একের পর এক ছবি– একের পর এক সাফল্য, সম্মান, যশ, খ্যাতি। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে এল শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। বাঙালি পরিচালক বোম্বের ফিলমি দুনিয়ায় স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম খোদাই করে নিল।

আর তখন থেকেই কবে যেন বাংলা থেকে, কলকাতা থেকে, চেনা জীবন থেকে ক্রমে দূরে সরে গেল সে। তার মানসী (এই নামটা সুবীরই দিয়েছিল) ভেবেছিল ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আবার তারা ফিরবে কলকাতায় চেনা জীবনের ছন্দে। কিন্তু সুবীর তখন হিন্দি ফিল্মের রূপালি দুনিয়ায় পথ ও মন হারিয়েছে।

তার তখন দেশজোড়া নামডাক, অপরিসর বাসা ছেড়ে বান্দ্রার অভিজাত পরিবেশে তার বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে অনুরাগীদের ভিড়। ক্রমেই যেন স্ত্রী, কন্যা বৃত্তের বাইরে চলে গেল। আর সেই বৃত্তে দেখা দিল এক নতুন মুখ– সুন্দরী উদীয়মানা নায়িকা। ... তারপর মৃদু গুঞ্জন, কিছু কলরব, কিছু কানাকানি, মিডিয়ায় মুখরোচক সংবাদ, স্টুডিও পাড়ায় ফিসফাস গুজব ছড়াতেই লাগল। বান্দ্রার বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের এক কোণে তখন মুখ লুকিয়েছে তরুণ পরিচালকের একদা প্রেমিকা বর্তমানে স্ত্রী, তার কন্যার জননী, তার মানসী।

কলকাতার সেই লাজুক হাস্যমুখী মেয়েটি স্বামীর জন্য বাড়িঘর বাবা-মা চেনা পরিবেশ সব ছেড়ে একদিন বেরিয়ে এসেছিল। সেদিন যার হাত ধরেছিল পরম আশ্বাসে, যার চোখে চোখ রেখে নতুন স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল কবে কখন সেই হাতের বাঁধন আলগা হল, বোঝেনি।

প্রথমে মনে হয়েছিল পরিচালকের কাছে ছবির নায়িকা আসতেই পারে, হতেই পারে অন্তরঙ্গ, কিছুটা ঘনিষ্ঠও। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারল এ শুধু পরিচালকের ছবির নতুন নায়িকা নয়, হয়ে উঠেছে তার জীবননাট্যের নতুন নায়িকাও।

হয়তো তার নিজেরও কিছু দায় ছিল। অন্তরালবর্তিনী না থেকে রূপালিজগতের তারকাখচিত মহলে সে আত্মপ্রকাশ করতেই পারত নায়িকা নয়, গায়িকা রূপে। ছবিতে নেপথ্য গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার যোগ্যতা তার ছিল। অনেক নিভৃত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তার স্বামী মানসীর কণ্ঠের যাদুতে মুগ্ধ হয়েছে কতদিন।

আসলে নিরুচ্চার অভিমানে তার মনে হয়েছিল তার

এক সপ্তাহ আগে পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সমাবর্তনে তার নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘দি আনটোল্ড স্টোরি’ (অকথিত কাহিনি) শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছে; আর সেই পুরস্কার তার হাতে তুলে দিয়েছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববরেণ্য বাঙালি চিত্র পরিচালক সুবীর চৌধুরী। দর্শকাসনে বসা তার মা মঞ্চে দেখেছিল স্বামী ও কন্যা– দুই প্রজন্মের দুই সফল চিত্র পরিচালককে।

পরিচালক স্বামীইতো নিজে থেকে তাকে সেই সুযোগ করে দিতে পারত, প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে সে চায়নি। আর সেই অভিমানের আঁধিই তাদের মধ্যে আনল ব্যবধান। কোন তীব্র কলহ নয়, বাদানুবাদও নয়, এক অন্ধ অভিমানে সে অনেক অনেক দূরে সরে গেল। যেদিন তাদের মেয়ের জন্মদিনে বাবার জন্য অপেক্ষায় থেকে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল সাত বছরের মধুয়া, আর সে জেনেছিল সুটিংয়ের জন্য নোনাভালার ফার্ম হাউসে পুরো ইউনিট ও নায়িকাসুদ্ধ রাত কাটিয়েছে চিত্রপরিচালক পিতা, সেদিন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। চিরদিনের নিরুচ্চার শান্ত মেয়েটি মনে মনে তার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সে ফিরে যাবে, কলকাতায়। তাদের ছোট্ট মেয়ে– বাবার প্রথম সফল ছবি ‘মধুমতী’র নামে যার নামও মধুমতী, বাবা-মার আদরের ‘মধুয়া’– সে-ও যেন সাত বছরেই অনেক পরিণত হয়ে উঠল।

আর তাদের কলকাতায় চলে আসার কিছুদিন পরেই সব সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এল প্রখ্যাত পরিচালক ও সুন্দরী নায়িকার শুভ পরিণয়ের সুসংবাদ। বান্দ্রার বিলাসবহুল গৃহের নতুন সংসারে যখন আরেক নতুন অতিথির জন্ম হল– তখন অনেক দূরে কলকাতার শহরতলীর এক অনামী স্কুলে শিক্ষিকার ভূমিকায় দেখা গেল পরিচালকের হারানো দিনের মানসীকে।

আবার সংগ্রামী জীবন, সেই প্রথম সময়ের নতুন দাম্পত্যের মত। তবে তখন তাতে ছিল স্বপ্ন দেখার আনন্দ, আর আজ শুধুই দিনযাপনের গ্লানি।

প্রথম প্রথম প্রতিবেশী মহলে কিছু গুঞ্জন, কানাকানি, কৌতূহল ছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা স্তিমিত হয়ে এল।

সময় বয়ে চলল তার নিজস্ব গতিতে। দেড় দশক প্রায় অতিক্রান্ত। আজ মধুয়া– মধুমতী চৌধুরী পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে চিত্র পরিচালনার শিক্ষা শেষে নিজের পথ বেছে নিয়েছে। না– বিখ্যাত বাবার কন্যা পরিচয়ে নয়, নিজের যোগ্যতায় সে প্রমাণ করেছে নিজেকে।

ঠিক, এক সপ্তাহ আগে পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সমাবর্তনে তার নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘দি আনটোল্ড স্টোরি’ (অকথিত কাহিনি) শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছে; আর সেই পুরস্কার তার হাতে তুলে দিয়েছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববরেণ্য বাঙালি চিত্র পরিচালক সুবীর চৌধুরী। দর্শকাসনে বসা তার মা মঞ্চে দেখেছিল স্বামী ও কন্যা– দুই প্রজন্মের দুই সফল চিত্র পরিচালককে। মধুমতী চৌধুরীকে চিনতে ভুল হয়নি সুবীর চৌধুরীর, মঞ্চ থেকেই তার দৃষ্টি দর্শকাসনের মধ্যে বোধহয় খুঁজতে চেয়েছিল কন্যার জননীকে; কিছু কি বলতে চেয়েছিল? সেই কাহিনিও অকথিত রয়ে গেল। কারণ সবার অগোচরে অনুষ্ঠানের মধ্যপথেই মানসী সেদিন হল ছেড়ে চলে গিয়েছিল, প্রধান অতিথির ভাষণ শোনা হয়নি। সেদিনই একা ফিরে এসেছিল কলকাতায়।

তিন.

আজ সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় দু’টি বিশেষ খবর । এক– সুবীর চৌধুরীর স্মরণ বাসর; দুই– নবীনা পরিচালক মধুমতী চৌধুরীর স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রের জন্য স্বর্ণপদক লাভ। দুই চিত্র পরিচালকের ছবি পাশাপাশি।

বান্দ্রার বিলাসবহুল বাসভবনে আজ বিশাল সভা, শোক যেন নিয়েছে উৎসবের চেহারা। আর কলকাতার ছোট্ট আবাসে মানসী একাকী অপেক্ষারত। দেওয়ালে টাঙানো সুবীরের তরুণ বয়সের সহাস্য ছবিতে মালা দুলছে। অপলকে তাকিয়ে মানসী, মনে মনে অনেক কথা বলা, যেন স্মৃতি ধূসরিমা উজ্জীবিত নতুন অনুভবে।

কলিং বেলের শব্দে সচকিত মানসীর মনে হল মধুয়া কি একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এল– ফ্লাইট তাহলে এসে গেছে নির্ধারিত সময়ের আগেই?

দরজা খুলে বিস্মিত মানসী নির্বাক। এতদিন পরে অপ্রত্যাশিত আগন্তুককে দেখলেও চিনতে ভুল হল না সুবীরের বন্ধু অসীম সেনকে। স্টুডিও পাড়ায় দু’জনে একসঙ্গে ঘুরেছে কতদিন। অসীম সেনও আজ নামী চিত্র পরিচালক।

– আপনি?

– বৌদি, অনেক কথা, বলার সময় নেই। আজই আমায় নেক্সট ফ্লাইটে ফিরতে হবে। কিন্তু আজকের দিনে আপনার কাছে এসেছি বিশেষ কারণে। বলতে পারেন সুবীরের শেষ অনুরোধ রাখতেই আপনার কাছে আসা।

– ‘শেষ অনুরোধ, ওর?’ গলা কেঁপে যায় মানসীর। তার অপলক দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য বিস্ময়।

– হ্যাঁ, আপনাকে একটি জিনিস পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিল সুবীর, বলেছিল সেটাতে একমাত্র দাবি ও অধিকার আপনারই।

ঠিক এ সময় আবার দরজায় বেল বাজল। দরজা খুলেই মধুয়া জড়িয়ে ধরল মাকে। অসীম সেন তার অপরিচিত নয়। তবু আজ এখানে তাঁকে দেখবে আশা করেনি। তাকে কিছু বলতে গিয়ে চোখ আটকে গেল দেওয়ালে ঝোলানো বাবার ছবিতে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাছে জরুরি অন্য কাজ।

– ‘মা, এটা তোমার, শুধু তোমার’– তার পুরস্কার স্বর্ণপদক মানসীর গলায় পরিয়ে দিল মধুমতী।

– ‘আর এটাও আপনার বৌদি। সুবীরের সব কথা অন্য একদিন বলব। আজ শুধু আপনাকে পাঠানো ওর উপহার দিতেই আমার এখানে আসা। এটা আপনার, শুধু আপনাই–’

বিস্মিত রুদ্ধবাক মানসীর হাতে অসীম সেন তুলে দিলেন জাতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক সুবীর চৌধুরীর পাওয়া রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ‘রজতকমল’।

দূরদর্শনে তখন বান্দ্রার স্মরণসভার পাশাপাশি দেখানো হচ্ছে পুরনো এক ক্লিপিং– রাষ্ট্রপতি শ্রেষ্ঠ পরিচালকের ‘রজতকমল’ উপহারে ভূষিত করছেন সুবীর চৌধুরীকে।

সেদিকে তাকিয়ে নির্বাক অসীম সেন, মধুমতী। আর নির্বাক প্রতিমার মত মানসী চৌধুরী। তার গলায় মধুয়ার পাওয়া স্বর্ণপদক আর দুহাতে বুকের কাছে ধরা সুবীর চৌধুরীর পাওয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান ‘রজতকমল’। দূরদর্শনের পর্দা থেকে সুবীরের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দৃষ্টি যেন মিলে গেল মানসীর অশ্রুপ্লাবিত মুখে। এক যুগ পর উৎসুক অভিমানী দুটি সত্তার আঁখির মিলন ঘটল জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে। মনে হল সকল কাঁটা ধন্য করে আজ ফুল ফুটেছে, সেই রজতকমল যেন এতদিন পরে মিলিয়ে দিল দু’জনকে; অনেক না বলা বাণী বলা হয়ে গেল মনে মনে। আর তারই নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মধুমতী চৌধুরী– ‘দি আনটোল্ড স্টোরি’– অকথিত কাহিনির নবীনা পরিচালক মানসী ও সুবীর চৌধুরীর আদরের মধুয়া।

মীনাক্ষী সিংহ ভারতের কথাসাহিত্যিক

ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবস

আবদুল মান্নান

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রাম বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় উঁচুমাত্রায় আসীন হয়েছে। অখণ্ড পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত করে আহ্বানকৃত সংসদ অধিবেশন স্থগিত করে নিরীহ বাঙালি জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ ১৯৭১ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে ও তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি নয় মাসে একটি রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে জাতিরাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। প্রথমত এই ব-দ্বীপের বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে আর যে-সব নৃ-জাতি বসবাস করেন তাঁরাও এই মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন তাই এই ভূখণ্ডের মানুষ জাতি হিসেবে বাঙালি আর নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি।

সাহিত্য কবিতা উপন্যাস নাটক সংগীত নৃত্যকলা এবং চিত্রকলায় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ যেমন গৌরবের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তেমনি হয়েছে আমাদের সমাজজীবনের নানান অনুসঙ্গে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ দিন ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেল ৪.৩১মিনিটে সেদিনের রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানী হানাদার বাহিনির সদস্য লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজির নেতৃত্বে যৌথ বাহিনির প্রধান ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ লে. জেনারেল জে এস আরোরা এভিএসএম-এর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনির আত্মসমর্পণের এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ভাইস এ্যাডমিরাল এন কৃষ্ণাণ পিভিএসএম, এয়ার মার্শাল এইচ সি দেওয়ান পিভিএসএম, লে. জেনারেল সগত সিংহ পিভিএসএম, মেজর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব, ফ্লাইট লে. এম এস সিহোটা, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস কে মেহরা, ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহ এমভিসি, ক্যাপ্টেন ওবেরয়, শ্রী সুরজিৎ সেন এবং বাংলাদেশের গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

যৌথ কমান্ডের বিজয়ী ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার্স ফোর্ট উইলিয়াম সেই গৌরবের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর আমাদের বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর সামরিক শিষ্টাচারে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে থাকে। ২০০৬ থেকে প্রতি বছর ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধা ছয়জন কর্মরত সামরিক অফিসার এবং তাদের সঙ্গীদের ইস্টার্ন কমান্ডের অতিথির মর্যাদায় কলকাতায় অবস্থানের সুযোগ দিয়ে ভারত সরকার সেদিনের সেই বিজয় দিবসকে মহিমান্বিত করে চলেছেন। এজন্য আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ভারত সরকার এবং ইস্টার্ন কমান্ডকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দল এবং আমাদের কলকাতা উপরাষ্ট্রদূতের দফতরকে স্বতন্ত্রভাবে বিজয় দিবস উদযাপন করার জন্যে।

ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের হেড কোয়ার্টার্স ফোর্ট উইলিয়াম। ফোর্ট উইলিয়ামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে কলকাতা-সূতানুটি-গোবিন্দপুর ৩টি গ্রামের সমন্বয়ে আজকের কল্লোলিনী কলকাতা এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একসূত্রে গাঁথা।

ইস্টার্ন কামান্ডের বিজয়স্মারক-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ

এককালের সূর্য অস্ত না যাওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অহংকারের বিশাল স্থাপত্য ফোর্ট উইলিয়ামের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্রোতস্বিনী হুগলি নদীর পূর্বপাড়ে ৭০.৯ একর জমির উপর। ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের রাজা ৩য় উইলিয়ামের নামানুসারে ১৭০০ খ্রি. এই দুর্গের নামকরণ করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম। ফোর্ট উইলিয়ামের নির্মাণকাজ শেষ করতে প্রায় দশ বছর লাগে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির সম্রাটের কিঞ্চিৎ শিথিলতায় সমৃদ্ধশালী বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা ১৭৫৬ ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক অভিযান চালিয়ে ফোর্ট দখল করে এর নাম বদলে তাঁর মাতামহ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নামানুসারে 'আলিনগর' নামকরণ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কলকাতার এই ফোর্ট উইলিয়াম বা আলিনগরের গার্ডরুমই Black Hole of Calcutta বা কলকাতার অন্ধকূপ হিসেবে ইতিহাস বিকৃত করে প্রজাবৎসল নবাব সিরাজ-উদ্-দ্দৌলাকে কলংকিত করার চেষ্টা করে।

১৭৫৭ পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা তাঁর প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলি খানের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভের কাছে নিদারুণভাবে পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ-দেশের শাসনসহ ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই ইংরেজদের হাতে চলে যায়। রবার্ট ক্লাইভ স্বল্পসংখ্যক সৈন্য এবং গোলাবারুদ নিয়ে পলাশীর যুদ্ধ জয়লাভ করেলও যুদ্ধজয়ের পরের বছর ১৭৫৮ থেকে সৈন্য সংগ্রহ এবং কোর্ট উইলিয়ামের পুনর্নির্মাণে মনোযোগী হন। এই নির্মাণ কাজ শেষ করতে প্রায় তেইশ বছর লেগেছিল। আর এতে ব্যয় হয়েছিল ২০ লক্ষ পাউন্ডের অধিক। আটকোনা আকারে চুনসুরকির এই বিশাল স্থাপনা নয় মিটার গভীর পনের মিটার চওড়া পরিখা পরিবেষ্টিত।

পাঁচ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অনুচ্চ দালানের ফোর্ট উইলিয়ামের তিনদিকে স্রোতস্বিনী হুগলি নদী। অন্যদিকে ব্রিটিশ নাগরিকদের উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত প্রখ্যাত সেন্ট পিটার্স চার্চ যা বর্তমানে ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার্সের লাইব্রেরিতে পরিণত হয়েছে।

ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার্স ফোর্ট উইলিয়ামে দশ হাজার আর্মি পার্সনেলের আবাসিক সুবিধা রয়েছে। একাধিক সুইমিং পুল, শপিং মল,

ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি-ইন-সি-র সঙ্গে লেখক

সিনেমা হল, লন্ড্রি, রেস্টুরেন্ট, খেলার মাঠ, নয় হোল বিশিষ্ট গলফ কোর্স, পোস্ট অফিস ইত্যাদি।

সেনাবাহিনির সঙ্গে ইস্টার্ন কমান্ড ফোর্ট উইলিয়ামের খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের অন্যান্য গ্যারিসনের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। এই পরিচিতির ক্ষেত্র ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং স্বাধীন ভারতের অন্যতম দুর্গের মর্যাদা বহন করে চলেছে।

বিশাল স্থাপনা ফোর্ট উইলিয়ামের ছয়টি গেট বা সিংহদরজা রয়েছে– এগুলো হল চৌরঙ্গি গেট, পলাশী গেট, ক্যালকাটা গেট, ওয়াটার গেট, সেন্ট জর্জ গেট এবং ট্রেজারি গেট। ১৮৯৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি আর্মির বিলুপ্তির ভেতর দিয়ে ইস্টার্ন কমান্ড প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৩৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মিরাট, লক্ষ্ণৌ, বেঙ্গল, আসাম, দিল্লি সামরিক জেলাসমূহ ইস্টার্ন কমান্ডে অধীভুক্ত হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনির ইস্টার্ন কামান্ডের শতাব্দিপ্রাচীন সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ প্রতীক বা লোগো হচ্ছে 'উদীয়মান সূর্য'। স্বাধীনতার পূর্বাপর ভারতীয় সেনাবাহিনির বিকাশের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এই কমান্ড রাঁচিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কলকাতায় স্থানান্তরের আগে লক্ষ্ণৌতেও স্থানান্তরিত হয়েছিল।

বর্মায় (বর্তমান মায়ানমার) বহুল আলোচিত সামরিক অভিযান, ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ইস্টার্ন কমান্ডের সরাসারি অংশগ্রহণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

বীরত্ব আর গৌরবের ইতিহাস স্বীকৃত ইস্টার্ন কমান্ড রাষ্ট্রীয় সম্মানসহ ভারতের আপামর জনগণের কাছে সসম্মানে আসীন রয়েছে দেশরক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং স্বাধীন ভারতের ধারাবাহিকতা এই কমান্ডের গৌরব। ইস্টার্ন কমান্ডের স্বল্পকালীন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ ছিলেন জেনারেল কে এম কারিআপ্পা ওবিই– যিনি ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ স্বাধীন ভারতের প্রথম কমান্ডার-ইন-চিফ মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন এবং পরে ভারতের প্রথম ফিল্ড মার্শালের পদ অলংকৃত করেন। ইস্টার্ন কমান্ডের আরেকজন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফও গৌরবময় ফিল্ড মার্শাল মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনির চিফ অফ দি আর্মি স্টাফ পদ অলংকৃত করেন এই কমান্ডের সাতজন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ। ভারতের আর কোন কমান্ড এ পর্যন্ত এ গৌরবের অধিকারী হতে পারেনি।

ভারত এবং ভারতের সামরিক ইতিহাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে গৌরবোজ্জল অর্জন। তাই আমাদের বিজয় ভারতের ইস্টার্ন কমান্ড প্রতিবছর সামরিক রীতিতে উদ্‌যাপন করে থাকে। এই মহাসমরে ভারতের সশস্ত্র বাহিনির প্রায় নয় হাজার যোদ্ধা শহীদ হয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতাকে গৌরবান্বিত করে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। এই সামরিক অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতের বীর সৈনিকেরা আনুষ্ঠানিকতায় উপস্থিত হন– এঁদের সবাই বর্তমান অবসর জীবন যাপন করছেন। মুক্তিবাহিনি ও ভারতের প্রায় সাড়ে তের হাজার নিয়মিত শহীদ সেনাবাহিনির পাশাপাশি রাশিয়ার নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। আমাদের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার জন্য ভারতের আগ্রহে রাশিয়া জাতিসংঘে তিনবার শুধু ভিটো প্রদানই করেনি, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বঙ্গোপসাগরকে মাইনমুক্ত করতে রাশিয়ার মেরিন সেনারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। রাশিয়ার বীর শহীদ মেরিনসেনাদের সমাধি চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সৈকতে বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভেটার্ন সেনাসদস্যদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চলেছেন ভারত সরকার। ২০১৬ সালে ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের ডিফেন্স উইংয়ের সৌজন্যে ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধা এবং ছয়জন কর্মরত সামরিক কর্মকর্তা এবং তাঁদের সঙ্গী ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন-চিফ লে. জেনারেল প্রবীণ বকশি এভিএসএম, ডিএমএস, এভিসি-এর আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি। কর্মরত সামরিক কর্মকর্তাদের অন্যতম ছিলেন যশোরের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। প্রতিনিধিদের ছত্রিশ সদস্য এবং তাঁদের সঙ্গীরা কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে অবস্থান করেন। ২০১৫ সালের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান ১৪-১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৬ সালের উদ্‌যাপনের কর্মসূচি একদিন বেড়ে ১৪-১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। এবার শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীকে অন্তর্ভুক্ত করায় শুধু এ কর্মসূচির কলেবর বাড়েনি, বেড়েছে আমাদের বাঙালি জাতিসত্তার শেকড়ের সন্ধানে যাওয়ার আকুলতা।

প্রতিনিধিদল ১৪ ডিসেম্বর কলকাতায় পৌঁছনোর পর কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় প্রিনসেপ ঘাটে আর্মির কনসার্ট দিয়ে। রাতে তাজ বেঙ্গলের বলরুমে অভ্যর্থনা ভোজ হয় প্রধান আমন্ত্রণকারী এমজিএসএস, এইচকিউইসি-র সৌজন্যে। পরদিন ১৫ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ামের আর্মি অডিটোরিয়ামে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণকারী

ভেটার্ন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা ও আমাদের পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিচারণ করেন। আমাদের মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধিদলনেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি স্মৃতিচারণ করে বলেন, দু'দেশের বন্ধুত্ব রক্তের আখরে লেখা যা কখনো ম্লান হবে না। ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ প্রতিনিধিদলনেতার বক্তব্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে দু'দেশের বন্ধুত্ব এ অঞ্চলে শান্তি এবং সমৃদ্ধির সুবাতাস পরিব্যাপ্ত করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল আরটিসিতে। ময়দানের দক্ষিণপাশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি সংশ্লিষ্ট আর্মি অফিসার আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বিনোদন ক্লাব। এখান থেকে ময়দানের পুরো অংশ বিশেষ করে হর্স রেস বা ঘোড়দৌড় প্রত্যক্ষ করা হয়। এ কমপ্লেক্সের লিফ্টগুলো অসাধারণ সমৃদ্ধ এবং ভিক্টোরিয়ান যুগের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। ভারত এই লিফ্টগুলো অবিকল রেখেছে– আধুনিকতার ছাপ লাগতে দেয়নি। মধ্যাহ্নভোজের পর ময়দানের তাঁবুতে বসিয়ে সামরিক কুচকাওয়াজ দেখানো হল। ঘোড়া ব্রিগেড, গাধা ব্রিগেড, উট ব্রিগেড, সারমেয় ব্রিগেডসহ বিভিন্ন সামরিক কমান্ড এবং যুদ্ধকৌশল আমাদের মুগ্ধ করে। ভারতের বিমান বাহিনির যুদ্ধজাহাজ ও হেলিকপ্টার বিভিন্ন রকম ফ্লাইং এয়ার ড্রপ এবং কৌশল প্রদর্শন করে সামরিক বাহিনির উৎকর্ষতা এবং সাহসিকতা প্রদর্শন করে। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীতথাগত রায়। রাতে তাজ বেঙ্গলে বুফের মধ্য দিয়ে সেদিনের অনুষ্ঠানে শেষ হয়।

পরদিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মূল আনুষ্ঠানিকতা সামরিক শিষ্টাচারে ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয়স্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে সূচিত হয়। সামরিক বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন-চিফ লে. জেনারেল প্রবীণ বকশি, ভাইস এ্যাডমিরাল হারিশ বিশট এবং এয়ার ভাইস মার্শাল আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়স্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম আর্মি কমান্ডারের বাসভবন 'সেনাপতি ভবন'-এর বিশাল সবুজ লনে দুপুরের আনুষ্ঠানিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরার মান্যবর রাজ্যপাল শ্রীতথাগত রায় এই ভোজে অংশগ্রহণ করে আমাদের সম্মানিত করেন। সন্ধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামের স্টেডিয়ামে বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় সংগীত, আমাদের জাতীয় সংগীত, দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। বীর সৈনিকেরা আঞ্চলিক নৃত্য পরিবেশন করেন। বিজয় দিবসের মহিমামণ্ডিত অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। রাতে সামরিক শিষ্টাচারে বিজয় দিবস নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয় আর্মি অফিসার্স ইনস্টিটিউটে। এখানে ফোর্ট উইলিয়ামের সামরিক অফিসার এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী অবসরপ্রাপ্ত এবং খেতাবপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা তাঁদের পত্নীদের নিয়ে উপস্থিত হওয়ায় আনুষ্ঠানিক নৈশভোজ এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

এই অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি এবং ভারতের খেতাবপ্রাপ্ত অবসর গ্রহণকারী সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে অতি সাধারণ একজন মহিলা হুইল চেয়ারে তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধুসহ উপস্থিত হন। ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী এই মহিলার স্বামী আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যশোর সেক্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনির সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন। এই বীর সেনানি ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'পরম বীরচক্র' খেতাবে ভূষিত হন। সেদিনের সেই গৌরবোজ্জ্বল নিয়মতান্ত্রিক অনুষ্ঠানে সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি ছিলেন শহীদ 'পরম মহাবীর চক্র' সম্মানে ভূষিত শহীদ সৈনিকের স্ত্রী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ। ভারত ন্যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ করে নিকট প্রতিবেশীর ন্যায্য দাবি সমর্থন করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনির ৯৩ হাজার নিয়মিত সৈন্য যৌথবাহিনির প্রধান ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডার-ইন-চিফ লে. জেনারেল জে এস অরোরার কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। আধুনিক পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এত অধিকসংখ্যক সৈনিকের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর যোগ্য কন্যা এবং নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি স্বাধীনতা সংগ্রামী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পৌত্রী ভারতের অবিসংবাদিত নেতা ভারতরত্ন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বৈশ্বিক রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, ভারতের আধুনিক সেনাবাহিনির রণকৌশল ও বীর সৈনিকদের অপরিসীম তেজস্বিতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের ফলে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এই মুক্তিযুদ্ধের ফলে ভারতের সেনাবাহিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনির মর্যাদা লাভ করে– ভারতের সফল কূটনীতি বিশ্বনন্দিত হয়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনির এ-দেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আল শামস্-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম আর বাংলার আপামর জনগণের ত্যাগ এবং বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ এবং রাষ্ট্রের সমর্থনে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

প্রফেসর আবদুল মান্নান
সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

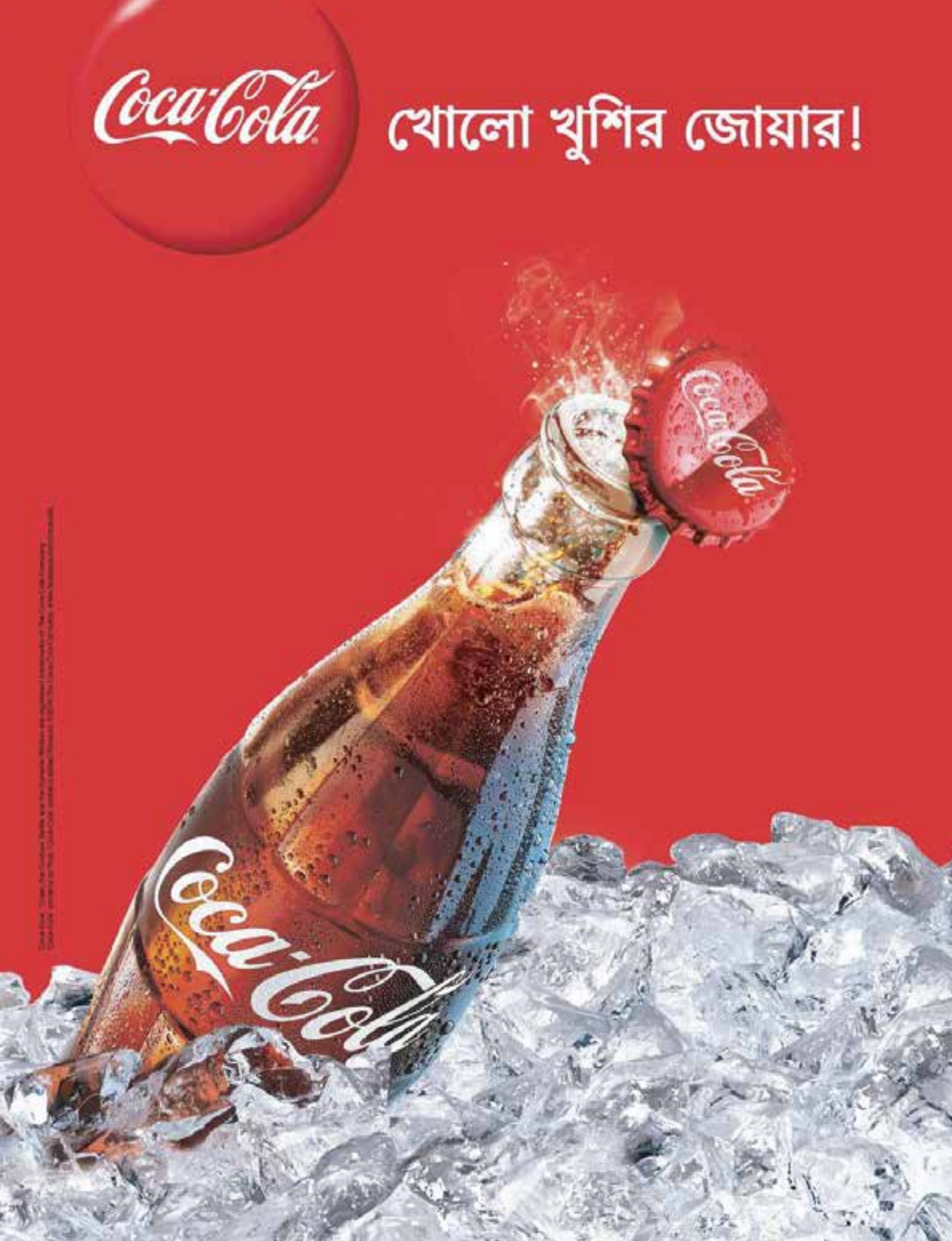

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola

ঘরহারা

কনক চৌধুরী

ফেঁটে যাওয়া বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি আমার ঘর
রাতে শিশির জমতে থাকে ঘরের চালে
এ দেখে কষ্ট পায় জোছনা
পাছে শিশিরের ভারে ধসে যায় সে ঘরখানি!
সে তার সবটুকু উত্তাপ ঢেলে শুকিয়ে দিতে চায় শিশির
এতে হিতে হয় বিপরীত
শিশির জোছনার ওম পেয়ে যেন আরও বসে জেঁকে।

রাতের শেষ বেলা
বাঁশের খুঁটির কাঁধের ভার বাড়তে থাকে
ভেঙে যাবার আগে ওরা মচ্‌মচ্‌ করে জানায় আর্তি
সে আর্তি শুনে শিশির নিজেকে ভাবে অপরাধী
নড়বড়ে ঘরের চালে এত ভার দেওয়া তার উচিত হয়নি
চাল থেকে সে টুপটাপ ঝরে পড়ে
টিকে যায় ঘরখানি।

দক্ষিণের জাফরি দিয়ে ঢুকেছিল দখিণা বাতাস
বের হয়ে গেছে উত্তরের জাফরি দিয়ে
সে শুনেছে সে আর্তি কিন্তু মুখ খোলেনি
উত্তুরে বাতাস সেও শুনে গেছে এ আর্তনাদ সেই কবে
সেই শীতে তখন তার ভরা যৌবন
সেও গোপন করে গেছে এ কথা।

তারপর থেকে ওরা নির্বাক থমথমে
ওদের নিশ্চুপ বিষণ্নতা দেখে বৈশাখী ঝড় আঁচ করে
কোথায় যেন একটা গোল বেধেছে।

বাওকুড়ানি এ তল্লাট দিয়ে বইতেই টের পায় সে গোপনীয়তা
সে-ই এ তথ্য তুলে দেয় বৈশাখী ঝড়ের হাতে।

সুযোগ বুঝে এক অমাবস্যা রাতে
আমার ঘরখানি গুঁড়িয়ে দেয় অকালের কালবৈশাখী
তারপর থেকে ঘরহারা আমি।
তাই বন্ধু, যদি আসো দেখা হবে একুশের বইমেলায়
ও মেলায় আমি বই ফেরি করতে আসব।

আত্মনিমজ্জন

মুজিবুল হক কবীর

বৃষ্টি যেন ডানাভাঙা পাখি– ঝাঁক বেঁধে নেমে আসে
স্বপ্নবিভাসিত আঙ্গিনায়।
বৃষ্টিজলে ডুবে যায় আমার চোখের পাতা–
ভিজে যায় হাতের লেখায় ও রেখায় ভরা পরিত্যক্ত রাফখাতা,
ভোরবেলাকার পাঠশালা চোখের আড়ালে চলে যায়–

পুকুরের জলে জেগে থাকা নৌকোর গলুই যেন
পুরোপুরি জলমগ্ন হয়–
জলপ্রিয় মাছরাঙা থির বসে থাকে অনেক পাতার ভিড়ে
যজ্ঞডুমুরের ডালে,
কেটে যায় রাতের সময়।

কোন আলো নেই এ পৃথিবীতে, নিভে গেছে সব–
মনে হয় ছায়াচ্ছন্ন তমসায় নতুন দিনের শুরু,
আকাশে বিস্তর মেঘ, ডেকে ওঠে– শোনা যায় বহুদূর থেকে বজ্রস্বর–
যেন দুই যুদ্ধবাজ মুখোমুখি– পাণ্ডব ও কুরু,
ঘোরলাগা বৃষ্টিজলে ডুবে যায় আমার ইন্দ্রিয়-ঘর।

ফেরাতে পারি না স্বপ্ন-সংক্রমণ
সংসারের কোলাহল হলাহল ছেড়ে ডুবে যেতে ভাল লাগে–
ভাল লাগে এমন নিবিড় আত্মনিমজ্জন।

সীমাহীন বাঁকে

গোলাম নবী পান্না

সময়ের ঢেউ খেলে গড়ায় দুপুর
বুড়িগঙ্গার তীরে যুবতীর স্নান
কলসটা সাথী হয়ে মাটি গেঁড়ে বসা
শাড়ির আঁচলে যেন পাল উড়ে যায়।

ডুব দেয়া নারী চুলে টুপটুপ ভেজা
তাতেই মাঝির চোখে ছাউনি অভাব
অথচ জলের তরী সামিয়ানা টানা
খেয়াল হারায় মাঝি দূর সীমানায়।

নক্‌শী আঁচলে ঢাকে নদীর সে রূপ
চোখ জুড়ে পাল নেই– আঁচলের পাড়
ঘাড় ফেরা হালে মাঝি বৈঠা টেনেই–
বেতাল চালের ঢেউ দোলন খেলায়।

প্রিয় এ নদীর টান ফিরে ফিরে ডাকে,
স্বপ্ন-বিভোর করে সীমাহীন বাঁকে।

ঐ শোন কোটি মানুষের কণ্ঠ

প্রদীপ মিত্র

মনে পড়ে হীতেশদা, বাঙলার শরণার্থী শিবিরের কথা। ব্রজেনদা,
শিবির প্রধান। ঐ ঐ জুবুথুবু বাস্তুভিটাহারা ক্ষুধায় গলিত লাশের মত
শরণার্থী শিবিরের মধ্যে ছিপছিপে রাঙা চেহারার হাত দুটো মেলে কী করে যে
সামলাতে কুচোকুচো কাঁকরের মুখগুলো। প্রীতেন স্যানাল মাঝে মাঝে
খুব চটে গেলে, তাকে দিতে কষে চৌষাধমক। বিকাশদা তার সহকর্মী।
শিবিরের দেখভাল করা তার ত্বরিত কর্তব্য– মানবতার ঐ মর্মবাণী
তখন তোমার চোখজুড়ে সহসা ঝলক দিত আর তার বুক তীরবিদ্ধ
হরিণীর মত হত সবাক ও সচেতন। ওর দোষ সত্যিই যায় না ধরা; ভাবতাম
তার জায়গায় আমি হলে, আমিও অমন করতাম। এই কথা মনে মনে ভেবে ভেবে
সারিবদ্ধ সারি ধরে ধরে এগুয়েছি তিল তিল...। আমরা যে বাস্তুহারা!

বাঙলার তেরশো আটাত্তর। শ্রাবণের ঘনঘোর বর্ষার হামলা ও ঝাপটা।
শিবির উপচেপড়া জলের ফাঁপর আটকানো শ্বাস, চারদিকে নাভিশ্বাস!
ভয়ঙ্কর কলেরার মারাত্মক ক্রোধ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির হামলার চেয়েও প্রকট
তাঁবুকাঁপা কাবু কাবু মানুষের মৃত্যুদৃশ্য; ঐ মৃত্যুদৃশ্যের দৃশ্যের দৃশ্যেও
চিতার আগুন করেছেন ভীষণ বিদ্রোহ। বীরু ডোম, নীরু হাড়ি, দীনেশ চাঁড়াল
আর তার জনগোষ্ঠীর কী অবাককরা অর্চা-গর্জা হাত। তার মধ্যে হীতেশদা,
পরমাত্মীয় হয়ে সব সামলাচ্ছ যেন ভগবান সব সামলান তার জগতের ভার!

ঐ না হাঁটুমোড়া ক্যাঁতকেঁতে কাদা। থুকথুকে ঘেঁয়ো বিষ্ঠা। আতঙ্কের
গন্ধ ও দুর্গন্ধ, প্রাণকাঁপা চিকিৎসার হাঁক-ডাক, স্বজন-সম্পদ হারানোর হৈ হৈ
রোল যেন রেললাইনের সমান্তরাল পাত কেঁদে-কেঁদে যায় বহু বহু দূর; আমার হৃদয়
সদা কাঁপে, সদা কাঁদে হু হু...। অমন মুহূর্তে তোমার দরদভরা হাত
সম্বিত ফেরায়; আমরা যে যুদ্ধরত। জয় বাংলা! আহা মুহূর্তেই যেন
অগ্নিবর্ষী ছাত্রনেতা আব্দুল লতিফ মীর্জার উজ্জ্বল মুখটা তোমার ভেতর দেখি,
শুনি কাজী নজরুলের প্রদীপ্ত কণ্ঠস্বর: কারার ঐ লৌহ কপাট...!

প্রতিদিন আঁকির মেশানো দাঁত চ্যাপ্টা ভাত। ট্যালটেলে ডাল। ভেজা লাকড়ির
ধোঁয়াঠাসা তপ্ত তাঁবু ও টোকেন। রেজিস্ট্রি নাম্বার। পরিদর্শক মন্তব্য মতামত
অভিযোগ নিবন্ধন কত কিছুর ভেতর নজর সবার তরে সমানে সমান।
হট্টগোলভরা শিবিরের এ প্রান্ত-ও প্রান্ত ছোঁয়া হাঁটার ও দৃশ্য যেন মেঘছোটা মেঘ
কার কখন কী লাগে এইসব চাহিদা পূরণকালে
'দৃষ্টিতব' যেন ভাদ্রের মেঘের সমস্পর্শী। প্রাণতোষ ড্রাইভার,
খাদ্যভর্তি ট্রাক এনে তোমাকেই সর্বদা খোঁজেন। গুদামমাস্টার মোচ ছেটে
হয়ে উঠলেন ঠিক যেন মাদার তেরেসা। এখানেও ছিল হীতেদশার হাত
রবীন্দ্রনাথের মতন উদার ও উজ্জ্বল...। আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির
বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদী। বলি: হানাদার পাকিস্তান নিপাত যাক!

দুর্গাপূজা এল। বাঙলার যুদ্ধজয়ের ধ্বনিও আগুপাগু। আমরা ঐ
বার-তের-চৌদ্দ-ষোল বয়েসিরা হতবাক। ছেঁড়াছোঁড়া জামা। বোতামের
ঘাটে বোতাম কোথায় যেন নাওহারা খেয়াঘাট। বলি, হারানের ফাটাফুটো
প্যান্টে পাছা যায় দেখা চান্দের নাহাল। বাজার বেলায় ওকে নিয়ে গেলে
চক্রবর্তী মশায়ের কাছে এক দফা হল রফা। শিবিরের তহবিল গোনাগাঁথা,
হীতেশদার পকেট হয়নি ফাঁকা যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর:
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবা...!

মহালয়ার সাতসকালে ঢাকের বাদ্যে মুখর নগর। আমরা যুদ্ধের তরে
বাস্তুহারা। সর্বহারা। সবার নয়নভরা ভয় ও বিস্ময়ে শরতের মেঘের ছটকা
উড়ে উড়ে যায়। অকস্মাৎ নীল আকাশের নিচে চৈতন্যের হাত তুলে
নিরাশার ঝালঝুল ঝেরে দেখা হল মা দুর্গার দশ দিগন্তবিস্তারি হাত,
'হীতেশদা, হীতেশদা'। যেমন বলেছি সত্তরের নির্বাচনে: নৌকা, নৌকা, নৌকা...

তাঁবু ঘুরে ঘুরে একআনা-চারআনা করে তোলা হল তোলা,
হীতেদশা নেতা; মানুকাকা কারিগর, পুরোহিত শ্যামরঞ্জন মুখার্জি। কাঠ-
খড়-দড়ি-নড়ি সব আয়োজনে মহাখুশি; শুধু-ফুল-ফল জোগাড়ে ব্যাঘাত
কারও বাগানে হাত না দেওয়াই ভাল। সবশুনে হনুমানের মতন হীরুদর্জি
তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: বীরপুজোয় এ ভক্ত আছে; জয় বাংলা!

'যা দেবী সর্বভূতেষু রণরূপেণু সংস্থিতা। নমস্তেসৈ, নমস্তেসৈ, নমস্তেসৈ নমঃ নমঃ'
উচ্চস্বরে চণ্ডীপাঠ, রাম প্রসাদীভজন, দেশাত্মবোধক
গান কবিতা আবৃত্তি নাচ– সব হল খিচুড়ি প্রসাদ আর তুমি হীতেশদা,
পদ্মপাতার কোরক খুলে গাইলে দু'খানি গান। কলকাতা থেকে এলেন প্রভাস সেন,
সন্ধ্যা মুখার্জি, সুরেন ঢাকী, জ্যোতি বসু, প্রণব মুখার্জি। জয় বাংলা আর আকাশবাণীর
নেতা-কর্মী-শিল্পী, সাংবাদিক অনেকেই। এলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ক্রমান্বয়ে
জাতিসংঘের ওপর চাপ বাড়ালেন যেমন জাঁতিতে সুপারি কাটেন। তিনি অতি
দৃঢ় কণ্ঠে বললেন: দেখ, যুদ্ধরত বাঙালির চিত্ত!
বাঙলা মায়ের সিঁথির সিঁদুর কেড়ে নেয় কার আছে অতো দুঃসাহস।

থমকে থমকে থমক জড়ানো রোল ওঠা হাসি কান্নার তরঙ্গ বেগবান
বর্ষার মেঘের মত, বর্ষার জলের মত মুজিবনগর সরকার প্রধান, প্রধানমন্ত্রী
দেখতে এলেন সঙ্গে ভারতীয় হাই কমিশনার, রাশিয়া-ব্রিটেন, জার্মান-ফ্রান্স
সদ্যজাগা চরে জাগে নতুন বসত। মন বলে, কখন আমরা দেশে যাব!

ন্যাংটাপুটো আমরা ন্যাওটা। হীতেশদা, হীতেশদা বলতে অস্থির
যেন সেই প্রিয় পেয়ারা খাবার আশায় সদা চুকচুকে মনের দুপুর।
হাটে-মাঠে-ঘাটে ঐ বালুরঘাটে পরিচয়; পরিচিতি বেড়ে যায়। হাত খরচার
দুইআনা চারআনা প্রতিদিন হীতেশদা জোগান। শুনেছি তার জমিবন্ধক রাখার
কথা। হায় ভিটেহারা মানুষের মন জলের মতন ঘুরে ঘুরে কেঁদে কেঁদে যায়...
এ যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুগাথা!

ভারী রাগ হয়। নজরুলের মতন বুক খুলে বলি: 'থাকব না আর বদ্ধ ঘরে'!
ছুটে যাই নিরালায়, তাতানো তাঁবুর কাঁথা ভেজে দু'চোখের জলে
গোত্তামারা ঘুড়ির সুতাটা ঐ শূন্যে শূন্যে ওড়ে কিংবা কখনোসখনো
তাঁবুর কোনায় বসে থাকা ঘরকুনো কুনোব্যাঙ বিষাদে ঝিমায় কী করুণ...!

অকস্মাৎ কামানের গর্জনের মত গলা মেলে হাঁক-ডাক ছাড়ে হীতেশদা,
ধমকে বলেন: তোরা যুদ্ধ করবি আবার? আর আমরা শিকড়হীন
ঘাসের ডগায় খুঁজে খুঁজে ফিরি আপন মাটির টান। আহত পাখির
কণ্ঠ ও পালক। কিংবা পাখির চঞ্চুতে খুঁজে নেই বৃক্ষের শিকড় ও কাণ্ড...।
দ্বাদশীর শুক্লা চাঁদের চাঁদলচোখ তুলে দেখি গোটা দল তার চারদিকে
মনে হয় অকস্মাৎ কোন এক অজানা মেঘের ঝাপ্টায় অমন
জ্যোৎস্না হঠাৎ হারায় কোনো দাগী অপরাধী, হবে বিচার আমার!

মৃদুহাস্যে হীতেশদা হাত ধরে টেনে এনে দাঁড় করালেন এক ঝুপড়িখানায়
ঘাম ঝরে দরদর না জানি কী হয়! বললেন: এই পত্রিকার
বান্ডিল সর্বত্র বেচবি বেহুদা। তোদের দেশের দেশের কথা, যুদ্ধজয়ী কথা।
এইভাবে ভাগাভাগি হল আমাদের যুদ্ধজয়ের অপার ভার। কেউ মুক্তিযুদ্ধ
শিবিরে, কেউ-বা চায়ের দোকানে। চানু-বেনু গেল দর্জিদের পাড়া।
রামু-সামুর বরাতে জুটে গেল এক ডাক্তারখানা যেন সবাই নিজের
খরচ নিজেই চালায়। ষাটোর্ধ্ব বীরেশ বসাক তার ছোল-পোল, বৌ-বেটিসহ
চলে গেলেন পাশের কোন এক বাড়ি তিনি পড়াবেন সেইখানে। রমেশঠাকুর
বিপদনাশিনীর পুঁথি ও পাঁচালি শোনাবেন তাঁবুতে তাঁবুতে তার জন্য শরণার্থী শিবিরের
তহবিল থেকে হল আলাদা ব্যবস্থা।
অমন করেই হল কিছু ঘরহীন আর্ত মানুষের কিছু কর্মসংস্থানের যো ও জোগাড়।
ইতিমধ্যে হৈ হৈ করে খোলা হল শিশু পাঠঘর। সেদিন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
তারাপদ রায় রাখলেন উদ্বোধনী ফুল। আর আমি পত্রিকা বগলে চেপে চিতা বাঘের
মতন উনসত্তরের কর্মীর মতন লাফিয়ে লাফিয়ে বলি: জয় বাংলা, জয় বাংলা...!

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পাসিং শো

অমর মিত্র

ষোল.

অতীন বাড়ি ফিরছে ট্রামে চেপে কলকাতা দেখতে দেখতে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বউবাজার অবধি একটু ফাঁকা ফাঁকা। তারপরও মেডিকাল কলেজ, ইউনিভারসিটি, প্রেসিডেন্সি পার হয়ে কলেজ স্ট্রিট জংশন। এরপর ট্রাম কখনও হয় গতিময়, কখনও হয় স্থবির। বিবেকানন্দ রোড, বিবেকানন্দের বাড়ি পার হয়ে রামদুলাল সরকার স্ট্রিট, হেঁদুয়ায় সিগনালে দাঁড়ায় ট্রাম। বহুদিন এমনি টানা বাড়ি ফেরেনি। স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিল সে। বুক হা হা করে উঠল। মনে হল নেমে যায়। জন ম্যাকারথির নামে রাস্তা নাকি এখন নেই। অন্ধকারে নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কলেজের দিকেই রওনা হল অতীন। কিছু একটা ফেলে এসেছে। হারিয়ে এসেছে। স্কটিশ চার্চ কলেজের বন্ধ গেটের সামনে পড়ে থাকতে পারে। লালু, লালু, কৃষ্ণপ্রসন্ন, অচিন, রণেন, অশোক, দুর্গা, শবরী, ছন্দা... হৈ হৈ করে উঠল সবাই। অতীন অতীন, আয় আয়, কোথায় ছিলি তুই, আমরা সবাই মজলিশ বসিয়েছি এখানে, কী খুঁজতে এলি?

অতীন বলল, সেই গান।

কোন গানরে, কোন গান?

হেঁদুয়ার জলাশয়, যার নাম আজাদ হিন্দ বাগ তার গা দিয়ে যাচ্ছে ওখারট স্কোয়ার।

কলেজের সামনের রাস্তার নাম অমনি ছিল। এখনো কি তাই? না কি বদলে গেছে। তার ডানদিকে পড়ে থাকল সেই বসন্ত কেবিন। এই কেবিন ঘিরেই কলকাতা। কেবিনের বুড়ো একদিন বলেছিল, তোমরা যেখানে বসেছ, সেই টেবিলেই বসত পার্থ, মনোজ, নৃপেন, মহান, জগন্নাথ... ক্লাসের নাম নেই, শুধু নাটক আর নাটক। পার্থপ্রতিম বেঁচে নেই এখন। তারা যখন কলেজে সেই পার্থপ্রতিম তখন সিনেমার মানুষ, কত ভাল ছবি করেছে। এই সেদিন দেখল ছায়াসূর্য আবার। সে আর শম্পা, কাঁদল। জানো এই পার্থপ্রতিম আমাদের কলেজের ছাত্র। অনেক সিনিয়র। আরো আছে, শুনবে?

অতীনের সব মনে পড়ে যাচ্ছে। ক'বছর আগে কলেজের রি-ইউনিয়ন হল, তাকে কেউ ডাকেইনি। সে খুব সাধারণ, খুব। কিছুই করতে পারেনি জীবনে, তো তাকে ডাকবে কেন? আর লালু মানে কৃষ্ণপ্রসন্ন বেঁচে নেই। চল্লিশেই সুইসাইড করেছিল। সে বেঁচে থাকলে হয়তো হৈ চৈ করে ডেকে নিয়ে যেত তাকে। কৃষ্ণপ্রসন্ন ছিল সফল এক পেশাদার, এক কোম্পানির সর্বময় কর্তা। খুব ভাল রেজাল্ট ছিল ওর। ওকে না ডেকে পারত না রি-ইউনিয়নের কর্তারা। কিন্তু সে তো গিয়াছে চলিয়া।

তুমি না বলে গিয়াছ চলিয়া, নামিল অন্ধকার। তার পারিবারিক জীবন ছিল ছেঁড়া কাগজের মত। প্রেম ছিল না। আরো কিছু ছিল না হয়তো। যে জীবনের দেখা পেতে চেয়েছিল সে, সেই জীবনের দেখা মেলেনি কখনও। অতীন হেঁদুয়ার জলাশয়ের পিছনে গিয়ে স্কটিশ চার্চের সমুখে। রাস্তা অন্ধকার। কলেজ অন্ধকার। মস্ত গেটে তালা পড়ে গেছে ভিতর থেকে। অন্ধকারে সে পায়চারি করতে লাগল এদিক ওদিক। যেন কারোর আসার কথা আছে, দেরি করছে সে। অতীনের মনে হল গেট খুলে যাচ্ছে। হৈ হৈ করে লালু, মানস, দুর্গা, অশোক...,

কী ফেলে গেলিরে তুই? মুখ টিপে অন্ধকারে হাসে একজন। বল দেখি কী?

অতীন বলল, গান আর জন ম্যাকারথি লেন, জানিস?

সে বলল, নারে অতীন, ম্যাকারথি লেন নেই।

নেই, তাহলে কি পাসিং শো সাহেব মিথ্যে বলল?

হা হা হা পাসিং শো, এই দ্যাখ পাসিং শো। লালু বলল হাসতে হাসতে, তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীর অতি, বলল, দুরমুশ করে দিয়েছে সব, কলকাতায় আমি নেই, কিছুই নেই, ভ্যানিশ।

একেবারে গুলাম হুসেনের কথা, অতীন ট্রামে ওঠার আগে সে বলল, আপ ক্যানিং ডক যাইয়ে সাব, পাসিং শোর গোরা আদমি ডকের ঘাট, ক্যানিং পোর্ট গিয়ে বসে আছে।

অতীন ঘুরে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন ম্যাকারথি লেনে যায়নি?

কী করে যাবে সাব, দুরমুশ হয়ে গেছে সব, বস্তি পুড়ছে, বাড়ি ভাঙছে, কত বস্তি পুড়ল বলেন সাব, পরপর, কলকাত্তা থেকে সব ফুটে যাবে, হামি আপনি সব।

অতীন বলল, ক্যানিং গিয়ে কি রেকর্ড পাব আমি?

রিকডের ভার হামার উপরে ছেড়ে দিন, কিন্তু সে গোরা আদমি যে ডকের ঘাটে গিয়ে বসে আছে জাহাজের জন্য, হা হা হা, জাহাজ কি আসবে, রিভার বিকামস ওল্ড, বুড্ডহা হয়ে গেছে মাতলা, মাতলা বুড্ডহা।

বাড়ি ফিরে বৃত্তান্ত শোনাতে শম্পা বলল, ওঝা ডাকতে হবে।

কেন কী হল?

তুমি স্কটিশে গিয়েছিলে অন্ধকারে, পেলে খুঁজে?

না। মাথা নাড়ে অতীন, বলে, আচমকা মনে হল হেদুয়ায় ট্রাম দাঁড়াতে, লালু, কৃষ্ণপ্রসন্ন, তোমায় কি তার কথা বলিনি?

হ্যাঁ, বলেছ, তোমার গায়ে বাতাস লেগেছে মশাই, হয় কু, না হয় সু।

অতীন দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। নিলু রায়ের অ্যালসেশিয়ান ডাকছে। উফ, মানুষ এমন হয়?

কোন কারণ নেই কিন্তু বলেছে বিমল বিশ্বাসকে সে চোর বলে থানায় ঢুকিয়ে দেবেই দেবে। বিমল আসছে না কি ভয় পেয়ে? কে জানে? বাজারেও বসে না বিমল। নিলু তাকে বলেছে, কুকুর লেলিয়ে দেবে।

কেন রে নিলু কেন?

এমনি, আমার ইচ্ছে, শালা কেমন মাথা তুলে হাঁটে দেখিসনি, শুয়োরের বাচ্চা। নিলু রায় খ্যা খ্যা করে হেসেছিল পাগলা কুকুরের মত।

শম্পা তার গায়ে হাত রাখল, কেমন একটা বাতাস উঠেছে ক'দিন ধরে, বল।

হ্যাঁ, ওই বাতাসে বাতাসেই জন ম্যাকারথির গ্রান্ড গ্রান্ড সন, ম্যাকারথি জুনিয়র কলকাতায় হাজির।

কী সব অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে গো। শম্পা তার গা ঘেঁষে এল।

হ্যাঁ, জুনিয়র ম্যাকারথি জুয়োয় হেরেই ক্যানিং ডকে গিয়ে বসে আছে, পালিয়েছে, বাট নদীটি গিয়াছে চলিয়া, কপিল ভট্চায বলেছিলেন, এমনি হবে, উনিও অতুলানন্দের গানের জন্য গুলাম হুসেনের কাছে যেতেন।

উফফ্, তুমি না!

প্রেম জন্মাল কত বছর বাদে। নদী ঘুরে যেন মুখ দেখাল অন্ধকারে। ছলচ্ছল। তার হাত শক্ত করে ধরেছে শম্পা। বলছে, মশাই তোমার গায়ে এমন বাতাস লাগল, আমি এখন তোমায় নিয়ে কী করি?

কতদিন বাদে শম্পা এমনিভাবে কথা বলল। তার যত কথা সব এখন অনির সঙ্গে। আর অনিরও যত কথা সব তার মায়ের সঙ্গে। সে একটা বাতিল লোক হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। ফিয়েস্তা রেকর্ড পেয়ারের মত বসে যাচ্ছিল ঘরের কোণে। চাকরির আর বছর তিন, তারপরে পাকাপাকি তাই-ই হয়ে যেত সত্যি। বাতিল হতে হতে আবার মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারছে অতুলানন্দের জন্য। গানটা তাকে বাঁচিয়ে দিল। গান মানে সেই নদী। নদীটি তাকে রক্ষা করেছে স্থবির হয়ে যাওয়ার থেকে। নদী যে সভ্যতা গড়ে তা আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল। শম্পা বলল, আমি যাব তোমার গুলাম হুসেনের কাছে?

আচ্ছা যাবে।

আমি বের হব সেই গান খুঁজতে।

অমর মিত্র

অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও পারিবারিক আবহে সাহিত্য তাঁর বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন অমর। এর আগে, *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর, ২০০৪), সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার (১৯৯৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০১০)। বর্তমানে কলকাতা শহরে বসবাসরত অমর মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ১৯৭৪ সালে। প্রথম উপন্যাস *নদীর মানুষ* ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় অমৃত পত্রিকায়।

হারিয়ে একটি গান *পাসিং শো*-র কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাস একটি হারিয়ে যাওয়া গান আর হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে। মানুষ তার জীবনে যা হারায় তাই বুঝি ফিরিয়ে আনতে চায় এইভাবে। একটি গান রেকর্ড করে যে গায়ক মুছে গেছেন স্মৃতি থেকে, সেই গান বুঝি ফিরে আসে গভীর রাতে, বাতাসে ভেসে কিংবা স্বপ্নের ভিতরে। আশ্চর্য এই কাহিনি যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনেরই অন্বেষণ। আর এক অজ্ঞাতপ্রায় শিল্পীর প্রতিরোধে এই উপন্যাস পেয়েছে অনন্য এক মাত্রা। *পাসিং শো* যেন প্রবহমান জীবনের অফুরন্ত এক প্রদর্শন। *পাসিং শো* কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দল *সায়ক* নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছে নিয়মিত।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অমরের *ধ্রুবপুত্র* খরাপীড়িত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের কাহিনি– কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের এক বিপরীত নির্মাণ যেন। দীর্ঘ এই আখ্যান শেষ পর্যন্ত শূদ্র জাতির উত্থান ও কবির প্রত্যাবর্তনে পৌঁছয়।

আর বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত *অশ্বচরিত* তথাগত বুদ্ধের ঘোড়া কন্থক ও তাঁর সারথী ছন্দকের কাহিনি। লেখক ভারতীয় প্রতিবেশে জাদু বাস্তবতা ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে। অনন্য ক্লাসিকধর্মী এই উপন্যাস দু'টি বাংলা উপন্যাসে এক আলাদা রীতির জন্ম দিয়েছে।

অতীন বলল, হবে হবে হবে।

শম্পা বলল, বিমল বিশ্বাস কোথায় গেল গো?

অনি জানে। বলল অতীন।

সে নাকি গান দেবে বলে একজনকে নিয়ে গাঙে নৌকো ভাসিয়েছে?

উফফ, সব কেমন রংধনুর মত ছড়িয়ে পড়ছে, আচ্ছা বিমল কি নিলু রায়ের প্রতিহিংসায় পড়েছে, ওকে কি হাজতে ভরে পিটাই করিয়েছে নিলু? অতীন বলল, আমার ভয় হচ্ছে শম্পা, আমি যাই, নিলুকে জিজ্ঞেস করি।

মানুষ এমনি পারে, শুধু শুধু গরিব লোকটাকে হাজতে ঢুকিয়ে পেটাবে? শম্পার গলার স্বরে উদ্বেগ।

হতে পারে, নিলু এমনি কত করেছে একসময়। বলে অতীন।

শম্পা বলল, নাহ, পারবে না, বিমল বিশ্বাস সেই একটা লোককে নিয়ে গান খুঁজতে গেছে, তুমি ভেব না অতীনবাবু, নিলু রায় তার নাগালই পাবে না।

নিলুকে কাল আমি জিজ্ঞেস করব।

আবার নিলু, ও কি একটা মানুষ, দ্যাখো অতীনবাবু, তোমার গায়ে পরিষ্কার বাতাস লেগেছে, চল আমরা ক্যানিং যাই কাল সকালের ট্রেনে?

অতীন অবাক হল, ক্যানিং?

হ্যাঁ, সেই জন ম্যাকারথির নাতি না পুতি জন ম্যাকারথিকে খুঁজতে।

পাসিং শো সায়েব?

ইয়েস, পাসিং শো সায়েব, সে ক্যানিং ডকে গিয়ে ওয়েটিং ফর শিপ, দেশে ফিরবে।

সত্যি? ব্যালকনির অন্ধকারে শম্পার কাঁধে হাত রাখল অতীন। শম্পা হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, ফিরেও তো তাকাও না, তবু কি না গানটা মনে আসতে ছুঁয়ে দেখলে গো, যাবে ক্যানিং?

মরা নদী দেখতে? অতীন বলল, নদীটি গিয়াছে চলিয়া, কপিল ভট্চায অনেক দিন আগে বলেছেন এই কথা, নেই।

কী নেই? শম্পা ঘুরে তাকায়।

মাতলা মরে গেছে, ফেরি বন্ধ, ব্রিজ হয়ে গেছে পারাপারের, ক্যানিং ডক ডকে উঠেছে, শেষ নৌকা ছেড়ে গেছে অনেক বছর আগে। বলে মাথা নামায় অতীন, বিড়বিড় করে বলে, এমনিই হয় শম্পা, পাশাপাশি থেকে থেকে বয়স বেড়ে যায়, বিস্ময় ফুরায়, তখন মনে হয় ভালবাসা মরে গেছে, আসলে তা শরীরের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে শম্পা।

শম্পা কথা বলল না। নীরবতাই কথা হল। অনেক কথা। আনন্দ আর দুঃখের অশ্রু ভেজানো কথা।

সতের.

শহরজুড়ে আশ্চর্য বাতাস উঠেছিল। ঝড়ের মত। সমস্ত দিন ধরে বয়ে যাচ্ছিল। কখনও কখনও সেই বাতাস কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েও আবার বয়ে আসছিল দক্ষিণ-পুব থেকে। সেই সময় ফোন এল এক সন্ধ্যায়। আজিজুল ফোন করেছে, বলল, স্যার, আপনি গুলাম হুসেন চাচার সঙ্গে কথা বলুন।

হেলো সাব।

বলুন হুসেনভাই।

রিকড ঠিল মিলে যাবে, নূর মহম্মদকে বলা করেছি, উ বহুত এক্সপার্ট লোক।

কে নূর মহম্মদ? অতীন জিজ্ঞেস করে।

একটু থেমে থাকল গুলাম হুসেন, তারপর বলল, সারভিয়ার, আমিন, জমিন মাপা করে, নকশা দেখে জমিন চিনে নেয়, ক্যানিঙ বিয়েলারোতে সার্ভিস করে।

সে অতুলানন্দের গান জানে? অতীন জিজ্ঞেস করে।

নেহি স্যার, গান-বাজনা সে জানে না, তার কোন আইডিয়া নেই, জমিনের মাপ জানে, সে হামাকে বলেছে ক্যানিঙে এখনো পাসিং শো সিগারেট পাওয়া যায়, পানামা, উইন্ডসর, সিজার মিলে, চাইলে এনে দিতে পারে।

সে কী করে রেকর্ড খুঁজবে?

পারবে স্যার পারবে, ওয়েট।

সমস্তটা শুনে শম্পার মুখ থমথম করতে লাগল। সে বলতে লাগল, এ কী হচ্ছে, কী ব্যাপার কিছুই ধরা যাচ্ছে না।

কেন, গুলাম হুসেন যেভাবে বলল, কী কনফিডেন্ট!

আমিন খুঁজে আনবে গানের রেকর্ড, পাগল নাকি লোকটা?

কোন লোকের কথা বলছ?

কেন, তোমার ওই গুলাম হুসেন।

অতীন বলল, আমরা তো সব জানি না শম্পা, হতেও তো পারে।

শম্পা হাসে, বলে, গান কি জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট যে সারভেয়র-আমিন তা খুঁজে বের করবে, তুমি একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছ স্যার।

বলছ তুমি? অতীন বলল, গুলাম হুসেনকে দেখলে তো তা মনে হয় না শম্পা, ওর কাছে কপিল ভট্চায আসতেন পর্যন্ত, নিশ্চয়ই এই গান খুঁজতে।

শম্পা বলল, হতে পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু আমিন কী করে গান খুঁজে আনবে, তুমিও পাগল হয়ে যাচ্ছ অতীনবাবু, ভাল ভাল, কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো, তোমার ওই গান ক্যানিঙের মাতলা নদীর মত চলিয়া গিয়াছে গো, তোমায় নিয়ে আমি কী করব গো?

অনি এল একটু পরে। সমস্তটা শুনে বলল, হতে পারে মা।

শম্পা বলে, হ্যাঁ হতে পারে, আমিন গান খুঁজে আনবে, তবু না হয় নৌকোর মাঝি হলে হত, সে তো গান গায়।

অনি বলল, কে কী পারে, পারে না, তা আমরা বলতে পারি?

শম্পা বলল, তুই দ্যাখ তোর ফেসবুকে ওই লোকটা, নূর মহম্মদ আছে কিনা, ফ্রেন্ড হয়ে যা, তারপর তোর ফেসবুকে খোঁজ গানের রেকর্ডটার খবর কেউ জানে কি না, আমি তোদের দেখে যাই শুধু।

অনি জিজ্ঞেস করল, সেই তোমার ক্লাস ফ্রেন্ড, বিমল বিশ্বাস হারিয়ে গেল!

হারাবে না, আসবে, কোন অসুবিধে হয়েছে ঠিক।

আচ্ছা বাবা, একটা গান শুনলাম, গাঙে ঢেউ খেলিয়া যায়, কন্যা মাছ ধরিতে যায়, মাছ ধরিতে গিয়া কন্যা মরিস না..., দারুণ লাগল।

হেমন্ত, সিনেমার গান। বলল শম্পা, উফফ্, কোথায় শুনলিরে অনি?

অনিকেত বলল, শ্যামবাজারে, সিডির দোকানে বাজছিল, আমি তখন বাসে।

অতীন বলল, জলজঙ্গল কিংবা নতুন ফসল।

আমি জানি না, কিন্তু মা গাইত গানটা।

নিয়ে এলি না কেন গানটা? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

গান আরম্ভ হতেই সিগনাল সবুজ, বাস ছুটতে আরম্ভ করল।

অতীন বলল, আমিও দেখিনি সিনেমাটা, দেখিস তো পাস কি না।

অনি ঘাড় কাত করল। তারপর বলল, নদী নিয়ে যত গান আছে, সব কালেক্ট করলে হয় বাবা।

করতে পারিস, কপিল ভট্চায হয় তো তা করতেন।

অনি বলল, পৃথিবীর সব নদী কি শুকিয়ে যাবে বাবা?

না শুকোলে পৃথিবী বাঁচবে। শম্পা বলল, কিন্তু আমিন কি নদী খুঁজতে যাবেরে অনি?

অনি বলল, গ্রান্ড, কী দারুণ বলেছ মা, তুমি আমিন দেখেছ?

আমিন একটা প্রফেশন, ইনি উগান্ডার সেই ইদি আমিন নন, ইনি বিয়েলারোর আমিন, আমাদের মতই একজন। বলল অতীন।

আমি জানি বাবা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সে গান নয়, নদী খুঁজতে বেরোবে, সে ভেবেছে নদীটি গিয়াছে চলিয়া... কোথায় গেল সেই নদী।

অতীন কোন কথা বলল না। জানালার বাইরে থমথমে রাত। বাতাস আচমকা পড়ে গেছে।

এই পাড়া খুব শান্ত। মাঠ আছে, পুকুর আছে, বৃক্ষশোভিত নির্জন পথ আছে। মাঠ আর পুকুরের জন্য কংক্রিট জঙ্গল হয়ে ওঠেনি এই অঞ্চল। মাঠ, পুকুর পথ, নির্জনতায় পড়ে আছে। সেই নির্জনতা যেন আচমকা ঢুকে পড়েছে তাদের ঘরে। অতীনের মনে পড়ে গেল তার কলিগ গোপাল নস্করের কথা। সে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পিয়ালি বলে একটি স্টেশন থেকে আসে। সে বলে, তার গাঁয়ের পরে দিগন্তবিস্তৃত বাদা। শুধু ফসলের খেত। সেই সব জায়গা আসলে নদী মরে গিয়ে গড়ে উঠেছে। নদী ছিল, খাত ফেলে রেখে চলে গেছে। সাপ যেমন ধুলোর উপর দাগ

রেখে দিয়ে চলে যায় বিজন-বিভূঁয়ে, তেমনি। আমিন নূর মহম্মদ সেই চলে যাওয়া নদী খুঁজতে বেরিয়েছে। ওদের কাজ তো ওই।

সেটেলমেন্ট রেকর্ডে নদী আছে, মৌজা নকশায় নদী আছে, কিন্তু সরেজমিনে নেই। গেল কোথায়?

ওই দ্যাখো, নূর মহম্মদ হেঁটে চলেছে বাদার মাঠ ভেঙে। তার পিছনে পিছনে গুলাম হুসেন, বিমল বিশ্বাস, অতীন বসু, জিতেন মণ্ডল, দীপালি, শম্পা, অনি, অনিকেতের দিদি কেয়া, বাবা... অতুলানন্দ। যেন নদীই তাদের হারানো ভিটে, হারানো গান, হারানো সময়। নদীই তাদের এই জীবন, এই জন্ম, জন্মান্তর। গত জন্মের স্মৃতি। সেই স্মৃতিকে তারা বাস্তবে খুঁজে নিতে চাইছে।

স্মৃতি তো চলে যাওয়া নদীর মত, নদী কি আর তার উৎসে ফেরে?

কয়েকদিন পরে সে আবার আজিজুলের ফোন পায়, সে বলল, বাবু চলে আসুন কাল ইভিনিং-এ, মনে হয় কিছু একটা ক্লু পাওয়া গেল ইনকুয়ারিতে।

রেকর্ড, পাওয়া গেছে?

জানি না, লেকিন নূর মহম্মদ আমিন এসেছিল চাচা গুলাম হুসেনের কাছে।

আশ্চর্য! তার মানে পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে। নাকি নূর মহম্মদ তার কাছে কিছু জানতে চাইবে?

শম্পা বলল, ধুর, এ হয়, আমিন কি রেকর্ড খুঁজে দিতে পারে?

অতীন বলল, আসলে তো খুঁজে দিচ্ছে গুলাম হুসেন, সেই তো গানের আসল লোক।

ওর বাপ-ঠাকুদ্দা তো জাহাজিয়া ছিল, জাহাজিয়ারা কি গান বোঝে?

কে কী বোঝে তা আমরা কি জানি? অতীন বলে।

লোকটা কি আফিম নেয়? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

আমি তো জানি না শম্পা, কিন্তু ও গানটা খুঁজে বের করবে।

সেই রাতে আচমকা দিদি কেয়ার ফোন পায় অতীন। কেয়া বলল, ভাই, তুই পেলি?

পেতে পারি। অতীন বলল।

কেয়া চুপ করে থাকে কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, দ্যাখ ভাই, আমি না...

অতীন বলল, থামলি কেন, তুই কী বলতে চাইছিস?

আমি কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম, তারপর তা ভুলেও গেলাম।

অতীন জিজ্ঞেস করে, তারপর?

ভাই, সারাদিন ধরে স্বপ্নটাকে মনে করতে চাইছিলাম, মনে করতে পারছিলাম না, ইস, সারাদিন আমার কোন কাজে মন নেই, তোর দাদাবাবু গেছে ইন্দৌর, মেয়ের কাছে, ভাই সমস্ত দিন ধরে আমার মন খারাপ, এই একটু শুয়েছি, ঘুমঘুম পেল, আবার, স্বপ্নটা ফিরে এলরে, কী অদ্ভুত!

সেই স্বপ্নটা, মানে কাল রাতে যেটা দেখলি?

হ্যাঁরে ভাই, এই এখুনি।

কী স্বপ্নরে দিদি?

সেই অনেক বছর আগের স্বপ্নরে ভাই। কেয়ার গলা কেঁপে গেল, বলল, আমার যে কী হল, এমন স্বপ্ন কেন দেখতে গেলাম।

কী হয়েছে তোর দিদি?

এই দ্যাখ, সেই লোকটা, দ্যাট সিঙ্গার, সেই যে আনন্দদা।

হা হা দক্ষিণা বাতাস হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল অতীনের ঘরে। আনন্দদা? হ্যাঁ, সেই অতুলানন্দ তার দিদির আনন্দদা। একদিন শুনেছিল কিশোরী দিদির মুখে ওই সম্বোধন, আনন্দদা কেন আসে না রে?

কেন আসবে? সদ্য কিশোর অতীন জিজ্ঞেস করেছিল, আবার রেকর্ড হয়েছে?

দেখবি হবে, অনেক রেকর্ড হবে ওর।

হবে তো হবে।

অনুরোধের আসরে বাজবে। কেয়ার গলা কেঁপে যাচ্ছিল।

তোকে বলেছে, কবে বাজবে? অতীন জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি বলেছি আনন্দদাকে।

অতুলানন্দ...হি হি হি, কেমন নাম। অতীন হেসে গড়িয়ে যায় আর কী, দ্যাখ দিদি, আটিসের নাম হয় হেমন্ত, মান্না, তরুণ, অতবড় একটা নাম।

কেয়া বলল, পরের রেকর্ড বের হবে আনন্দ রায় নামে।

তোকে বলেছে?

হু, বলেছে। কেয়া তার লম্বা ঝুলের ঘটি হাতা ফ্রকের কোমরের ফিতে দাঁতে কাটতে কাটতে বলল।

দিদি, বললি না স্বপ্নটা। জিজ্ঞেস করে অতীন।

কেয়া বলল, ও কিছু না, থাক।

না বলবি তো ফোন করলি কেন?

ভাই যদি রেকর্ডটা খুঁজে পাস, গান একটা সিডিতে তুলে দিতে পারবি, আমি শুনব আবার, দ্যাখ আমি কতকাল বাদে কতবছর বাদে ঘুমের ভিতরে অবিকল গানটাকে শুনলাম।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁরে ভাই সত্যি, সেই যে সে গাইছে, আমরা সবাই বসে আছি, বাবার লেখা গান, বাবার হাতে পাসিং শো জ্বলছে।

অতীন বলল, সে তো পাশের বাড়িতে রেকর্ড বাজছিল।

বাড়িতেও তো গেয়েছিলরে, তোর মনে নেই?

অতীন বলল, মনে আছে।

তবে যে বললি?

অতীন বলল, দিদি আমি হয়তো রেকর্ডটা পেয়ে যাব, নূর মহম্মদ আমিন খুঁজছে, আমিন হারিয়ে যাওয়া নদী খুঁজে বের করতে পারে পর্যন্ত, কিন্তু বাজবে কী করে জানি না।

কেন, তোর ফিয়েস্তা আছে তো এইচএমভি-র।

পিন নেই, আমি খুঁজেছিলাম একসময়, পিন পাইনি।

তাহলে?

আমি জানি না রে, ওই গুলাম হুসেন যদি দিতে পারে পিন, সেভেন্টি এইট রেকর্ড তো, যাদের কাছে পিন আছে তো আছে, যাদের নেই, তাদের উপায় নেই। বলল অতীন। কথাটা সে শুনেছে তার কলিগ বিনায়কের কাছে। বিনায়কের এই অভিজ্ঞতা। লং প্লেয়িং রেকর্ডের পিন তবু মিলতে পারে, কিন্তু সেভেন্টি এইটের পিন সে অনেক খুঁজেও পায়নি। না পেলে গুলাম হুসেনের ওখানে বাজবে, সে সিডি করে নেবে, তারপর অনিকে দিয়ে ইউ টিউবে আপলোড করে দেবে। কেয়া বলল, যদি না বাজে, ইস, আনন্দদার কথা খুব মনে পড়ছে রে, বোবা হয়ে থাকবে শিল্পী, রেকর্ড যদি না বাজে!

অতীন বলল, আমি তোকে গান পাঠিয়ে দেব দিদি, রেকর্ডটা পাই আগে, দেখা যাক কী করে বাজানো যায়।

কেয়া বলল, আমার স্বপ্নের ভিতরে আনন্দদা কেন যে এল, ভাই মনে হচ্ছে আজ রাতেও আসবে আবার, আমি তো ভুলেই গিছিলামরে, তুই কেন মনে করালি।

অতীন বলল, সব কিছু বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছিল রে, তোর মনে হয় না, ফুরায়েছে জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার?

বুঝলাম না।

অতীন বলল, তোর মনে হয় না, মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে।

কী যে বলিস ভাই, এসব কথার কী মানে আছে? অসহায়তা ফুটল কেয়ার কণ্ঠস্বরে।

অতীন বলল, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি মনে হয় কোন এক বসন্তের রাতে।

এসব তো জীবনানন্দের কথা, কতদিন কবিতার বই ছুঁইনি, কেন ছুঁইনি জানি না।

অতীন বলল, আবার পড় নতুন করে।

কিচ্ছু ভাল লাগে না রে, মনে হয় ওয়েট করছি, কিন্তু এমন একটা ড্রিম এল, আমি তোকে বোঝাতে পারব না ভাই, গানটা পাঠাস যদি খুঁজে পাস, কিন্তু গায়ক কেন আর গান করেনি বল দেখি ভাই।

অতীন বলল, আমি জানি না, কিন্তু নূর মহম্মদ নিশ্চয় বলতে পারবে।

কথা বলতে বলতে একসময় কথা ফুরায়। অতীন চুপ করে যায়। কেয়াও।

মাটিতে উবু হয়ে বসে লুকিয়ে প্রায় গান শোনে অতীন। গানে গানে শান্ত হয়ে যাচ্ছে উন্মাদ পৃথিবী। দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে তাকায়। দেখল কতজন বসে আছে। অতুলানন্দের বিধবা, তার বছর চল্লিশের ছেলে, তাদের পিছনে সেই বিমল বিশ্বাস, ডুমুরিয়ার জিতেন মণ্ডল...অতীন সবাইকে দেখতে পায়।

আঠার.

অতীন একাই নামল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। তখন প্রথম আষাঢ়ের বিকেল। সেই যে ক'দিন ধরে ঝড়ের মত হাওয়া বইছিল, সেই হাওয়া থেমে গেছে গতকাল মধ্যরাত থেকে আচমকা। কিন্তু বৃষ্টি নামেনি কোথাও। খবরের কাগজে বৃষ্টির কোন খবর নেই। বৃষ্টির সময় তো এসে গেছে। বাতাসে তার ভাব টের পাচ্ছে অতীন। ওয়েলিংটনে নেমে দেখল তার জন্য বসে আছে গুলাম হুসেন রিকডিয়া আর আজিজুল। দোকান ভিতর থেকে বন্ধ। তাকে দেখেই আজিজুল বলল, চলিয়ে সাব, চাচা আর উয়েট করতে পারছিল না।

রেকর্ড কই? অতীন জিজ্ঞেস করল।

রিকড তো সিঙ্গারের বাড়ি, চলিয়ে সাব, সিঙ্গারের ঘর চলিয়ে। বুড়ো বলল।

অতুলানন্দ রায়?

আজিজুল বলল, ইয়েস স্যার, নূর মহম্মদের পাকা খবর।

আমিন? বিস্মিত অতীন তাকিয়ে আছে সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে।

হাঁ সাব, বললাম না, নূর মহম্মদ পারবে, চলিয়ে সিঙ্গারের ঘর।

কোথায়?

ফকিরচাঁদ লেন, ফকিরচাঁদে পুরানা হাভেলি, উ বেটা নূর মহম্মদ ঠিক খবর আনবে, এনেছে, চলিয়ে সাব।

অতুলানন্দ বেঁচে আছে?

আরে সাব, আটিস তো জিন্দাই থাকবে, আটিস মরে গিয়েও আবার জিন্দা হয়ে ওঠে, টাইম দিতে হবে তো, এই বলুন কাননবালা, ইন্দুবালার গান কত লোক খুঁজতে আসে, মরে গেছে তারা?

বলতে বলতে গুলাম হুসেন হাঁটে। তাকে অনুসরণ করে অতীন, আজিজুল। এখন কলকাতার ঘরে ফেরার সময়। বাস-ট্রাম ভর্তি করে মানুষ বাড়ি ফিরছে। কত মানুষ শিয়ালদা স্টেশনের দিকে হাঁটছে।

ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরবে। কত মানুষ হাঁটছে, শুধু হাঁটছে। অতীনের পাশে। অতীনের পিছনে। গুলাম হুসেনের পাশে। তার ছায়ায় ছায়ায়। অতীনের মনে হয় এরা তাদের সঙ্গেই চলেছে। এরাও সেই বিস্মৃত হয়ে যাওয়া গায়কের খোঁজে তাদের সঙ্গে চলেছে। সমস্ত কলকাতা চলেছে সেই চলে যাওয়া নদীর খোঁজে। সেই হারিয়ে যাওয়া শিল্পীর খোঁজে। গুলাম হুসেন গুনগুন করছে সেই গান। অবিকল সেই সুর।

সুর খুঁজে পেল কোথায়? কবে কোন কালে হয়তো শুনেছিল ওই গান, মনে পড়ে গেছে। গুলাম হুসেন বলছে, সাব, লিরিক কী সুন্দর! আপনার পিতাজি কী সুন্দর লিখেছিলেন, আর সুর কি সুন্দর, মারোয়া হবে, পুরবী হতেও পারে, নদীটি গিয়াছে চলিয়া... শুনে হামার কত নদীর কথা মনে পড়ে, কপিলবাবুর কথা মনে পড়ে, সব নদী শুখা করে দেবে মানুষ, সব নদী চলিয়া যাবে, নদীর ভিতরে পানির টান হয়ে যাচ্ছে বাবু, শুখা নদী, মানুষ ভি শুখা হয়ে যাচ্ছে, দয়ামায়া নাই...।

পথের সমস্ত মানুষ যেন নিঃশব্দে বলে উঠল, তাই তাই তাইই সত্যি।

গুলাম হুসেন বলে, কলকাত্তা ভি অমনি হয়ে যাচ্ছে বাবু, কলকাত্তার ভিতরে আর কলকাত্তা থাকছে না, কলকাত্তা থেকে কলকাত্তা চলে যাচ্ছে সাব, সিঙ্গারের পুরানা হাভেলি নিয়ে খুব গোলমাল, শরিকরা মকান তুলে দিল প্রোমোটারের হাতে।

তারপর? পথের সকলেই যেন ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল।

বুড়ি মা, মানে সিঙ্গারের ওয়াইফ দিবে না, নূর মহম্মদ আমিন গেল জমিন ভাগ করতে, ও খুব তুখোড় সারভিয়ার, আখো দেখা হাল বলে দেয়, জমিনের মাপ আন্দাজেই বলে দিতে পারে, দো কাঠা দেড় ছটাক জমিন সিঙ্গারের ফেমিলির রয়ে গেল, নূর মহম্মদ না থাকলে সিঙ্গারের ফেমিলি পারত না, তার ঘরের হাফ ভেঙে দিত, তখন বুড়ি আর তার বেটা যেত কোথায়?

আশ্চর্য! কথা বলতে পারছিল না অতীন। তখন একটু থেমে গুলাম হুসেন বলল, বাবু, সিঙ্গারের বেটা উন্মাদ আছে, পুরা মকান ভাঙা পড়ল, শুধু সিঙ্গারের ওয়াইফ তার পাগলা বেটাকে নিয়ে ভাঙা মকানে রয়ে গেছে।

অতীন বলল, আমার ভয় করছে রিকডিয়া ভাই।

গুলাম হুসেন বলল, বুড়ির ডর নাই, একা পাগল ছেলে নিয়ে প্রোমোটারের সঙ্গে ফাইট করল, ফুটে যেতে যেতে রয়ে গেল, দেখুন বাবুসাব, সব ফুটে যাবে, আটিস থেকে যাবে, তার গান বাতাসে ভেসে বেড়াবে।

কী কথাই না বলছে গুলাম হুসেন রিকডিয়া। মৌলালির মোড় থেকে শিয়ালদার দিকে না গিয়ে সিআইটি রোড দিয়ে ঘুরে কোন আলো-অন্ধকার পথে যে নিয়ে গেল। সেই পথে পাণ্ডুর আলো ছেয়ে আছে, ছায়া ছায়া মানুষেরা চলাফেরা করে। তারা দাঁড়াল এক নির্মীয়মাণ বহুতলের সামনে। গরগর করে ওঠে গুলাম হুসেন, প্রোমোটার খুব চেষ্টা করেছিল তুলে দিতে, লেকিন পারল না, নূর মহম্মদ মেপে বলে দিল দোকাঠা দেড় ছটাক সিঙ্গারের ফেমিলির আছে, তিন আনা চার গণ্ডা শেয়ার, আমিনের পাকা মাপ, কর্পোরেশনের সারভিয়ার পয়সা খেয়েও হেরে গেল, আরি বাবা, সে নদী মাপা করে, সমুন্দর ভি মাপা করতে পারে, একবার দেখবে তো মাপ বলে দিবে, সে বলল প্রমাণ করো, উসকি বাদ হবে হিসাব।

অতীন শিহরিত হচ্ছিল, জিজ্ঞেস করল, কিন্তু সেই বাড়ি কই রিকডিয়া ভাই।

পিছনে পড়ে গেছে, লেকিন ঘর আছে, ফেমিলি আছে, রিকড আছে, আটিস ফেমিলিকে কত লোভ দেখাল প্রোমোটার কুণ্ডু, আটিসের ফেমিলি না করল, কলকাত্তা নিয়ে বাবুরা পাগল হয়ে গেছে সাব।

অতীন তখন দূর থেকে ভেসে আসা গানের সুর শুনতে পায় বুঝি। সে বলল, গুলাম ভাই, চুপ, বাজছে মনে হয় সেই গান।

বাজতেই হবে, গান বাজলে পাগলা ছেলেটা শান্ত হয়ে যায় বাবুসাব।

তখন তারা, আজিজুল, গুলাম হুসেন আর অতীন নিঃশব্দে নির্মীয়মাণ বহুতলের দিকে হেঁটে গেল। তাকে ছুঁয়ে আছে আজিজুল, চাপা গলায় বলল, কী যে হচ্ছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না সাব, লেকিন সিঙ্গার বহুত আচ্ছি সিঙ্গার থা।

অতীন দেখল ধ্বংসস্তূপে একটুখানি আলো জেগে। যেন অন্ধকার নদীতে একটি নৌকার আলো।

সেই আলো এসে পড়েছে বাইরের মরা ঘাসে। ঘরে বেজে উঠেছে সেই গান, নদীটি গিয়াছে চলিয়া...পথ পড়ে আছে ধুলায়...। অতীনের দু'চোখ জলে ভরে গেল। আজিজুল বলছে, অতলানন্দ সিঙ্গারের এক বেটা, বাবার গান শুনলে বেটা শান্ত, থির, গাঙের উথালপাথাল পানিতে আর ঢেউ নাই।

শুনতে লাগল অতীন। মাটিতে উবু হয়ে বসে লুকিয়ে প্রায় গান শোনে অতীন। গানে গানে শান্ত হয়ে যাচ্ছে উন্মাদ পৃথিবী। দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে তাকায়। দেখল কতজন বসে আছে। অতুলানন্দের বিধবা, তার বছর চল্লিশের ছেলে, তাদের পিছনে সেই বিমল বিশ্বাস, ডুমুরিয়ার জিতেন মণ্ডল...অতীন সবাইকে দেখতে পায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, গুলাম হুসেন সিগারেট ধরিয়েছে। পাসিং শো। পাসিং শো পুড়ে যাচ্ছে তার হাতে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেই সায়েবও। গানে সেও মজেছে। অতীন নিচু হয়ে মাটিতে হাত দিয়ে সেই হাত কপালে ছোঁয়াল।

● সমাপ্ত

অমর মিত্র
সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক

রাজ্য পরিচিতি

মিজোরাম

মিজোরাম উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য। এর রাজধানী আইজল। মিজোরাম শব্দটি এসেছে মি (জাতি) জো (পাহাড়) রাম (ভূমি) অর্থাৎ 'পাহাড়ি জাতির ভূমি' থেকে। ভারতের উত্তর-পুবে এটি সর্বদক্ষিণের স্থলবেষ্টিত রাজ্য এবং ভারতের আট ভগিনী রাজ্যের (সিকিমকে নিয়ে এখন ভারতের ৮টি ভগিনী রাজ্য) ত্রিপুরা, আসাম ও মণিপুরের সঙ্গে সীমানাযুক্ত। এছাড়াও প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সঙ্গে এর প্রায় ৭২২ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। ভারতের অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের মত মিজোরাম ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আসামের অংশ ছিল। তারপর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯৮৭ সালের ২০ জানুয়ারি এটি ভারতের ২৩তম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজ্যের জনসংখ্যা ১০ লাখ ৯১হাজার ১৪জন। এটি দেশের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাজ্য। মিজোরামের ক্ষেত্রফল প্রায় ২১ হাজার ৮৭ বর্গ কিমি– এর প্রায় ৯১শতাংশ বনভূমি।

এক নজরে মিজোরাম

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	আইজল
বৃহত্তম শহর/ বৃহত্তম মহানগর অঞ্চল	আইজল
জেলা	০৮টি
প্রতিষ্ঠা	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
সরকার	
• শাসকবর্গ	মিজোরাম সরকার
• রাজ্যপাল	লে. জেনারেল নির্ভয় শর্মা
• মুখ্যমন্ত্রী	পু লালঠানাওলা (আইএনসি)
• আইনসভা	এককক্ষবিশিষ্ট (৪০টি আসন)
• হাইকোর্ট	গৌহাটি হাইকোর্ট এলাকা
আয়তন	
• মোট	২১,০৮৭ বর্গকিমি (৮,১৪২ বর্গমাইল)
• এলাকার ক্রম	পঁচিশ
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	১,০৯১,০১৪
• ক্রম	আটাশ
• ঘনত্ব	৫২/বর্গকিমি (১৩০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-MZ
সরকারি ভাষা	মিজো, ইংরেজি, হিন্দি
ওয়েবসাইট	mizoram.gov.in

লে. জে. নির্ভয় শর্মা

পু লালঠানাওলা

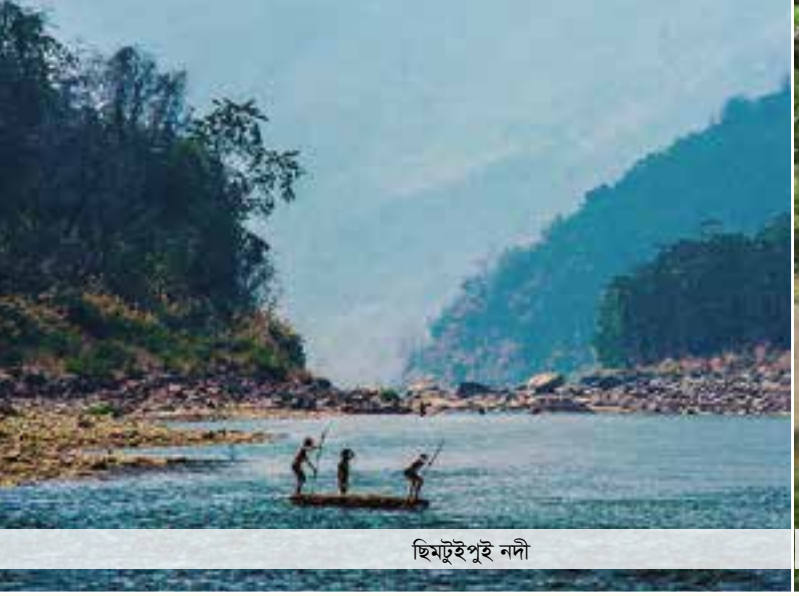

ছিমটুইপুই নদী

কৃষ্ণ ফলস্

মিজোরামের জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ উপজাতীয়। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এদের পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এটিই ভারতের সর্বোচ্চ উপজতি-অধ্যুষিত রাজ্য এবং তপসিলি উপজাতি হিসেবে এরা ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত। মিজোরাম ভারতের ৩টি খ্রিস্টান-অধ্যুষিত রাজ্যের অন্যতম।

মিজোরাম ভারতের কৃষি-অর্থনীতির উচ্চশিক্ষিত রাজ্য, তবে জুম চাষের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনে অনগ্রসর। সাম্প্রতিককালে উদ্যানচর্চা ও বাঁশ উৎপাদন শিল্পের প্রসারে জুম চাষের পরিমাণ কমে এসেছে। ২০১২ সালে রাজ্যের জিডিপি ছিল ৬ হাজার ৯৯১ কোটি রুপি (একশো কোটি ডলার)। মিজোরামের ২০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। দরিদ্র জনসংখ্যার আবার ৩৫ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে। আসাম ও মণিপুরের সঙ্গে জাতীয় মহাসড়ক যথাক্রমে ৫৪ ও ১৫০-এ সংযুক্ত মিজোরামে ৮৭১ কিমি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। মায়ানমার ও বাংলাদেশের সঙ্গে এর বাণিজ্য-যাতায়াত ক্রমপ্রসারমান।

ইতিহাস

মিজোদের উৎপত্তি উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য উপজাতীয়দের মত রহস্যময়। মিজো পর্বতমালায় বসবাসকারী জনগণকে প্রতিবেশী জনজাতিরা 'কুকি' নামে অভিহিত করে। অধুনা এদের 'মিজো' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। ব্রিটিশদের আগমনের আগে মিজোরা স্বায়ত্তশাসিত গ্রামে বাস করত। বর্ষীয়ান জনগণ-শাসিত মিজোসমাজে উপজাতীয় প্রধানরা বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতেন। এখানকার বিভিন্ন গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী জুম চাষ করত। গোষ্ঠীপতিরা জমির (রাম) একচ্ছত্র শাসক। গোষ্ঠীপতিরা আবার মণিপুর, ত্রিপুরা ও বর্মার রাজাদের কর্তৃত্বাধীন। গোষ্ঠীপতিরা উপজাতীয় খানাতল্লাশি ও মাথা-শিকারের ঘটনা ঘটাতেন। প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে আক্রমণ পরিচালনা করে পরাজিতদের দাস করা কি তাদের শিরশ্ছেদ করে তা গ্রামের প্রবেশপথে টাঙিয়ে রাখা ছিল বীরত্বের স্মারক।

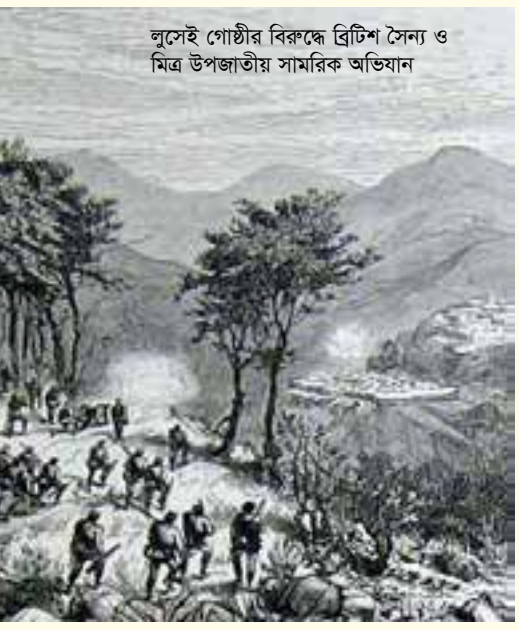

লুসেই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য ও মিত্র উপজাতীয় সামরিক অভিযান

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত লাগায় জনৈক *পালিয়ান* উপজাতীয় প্রধানকে শায়েস্তা করতে ক্যাপ্টেন ব্লাকউড মিজো পার্বত্যঅঞ্চলে সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। এর কয়েকবছর পরে ক্যাপ্টেন লেস্টার অধুনা মিজোর লুসেই উপজাতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হন। ১৮৪৯ সালে লুসেই উপজাতীয়দের অভিযানে ২৯জন ঠাডো নিহত ও ৪২জন বন্দী হয়। ১৮৫০ সালে কর্নেল লিস্টার ঠাডো উপজাতীয়দের সহযোগিতায় লুসেই উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে ৮০০ উপজাতীয় বাড়ি জ্বালিয়ে দেন এবং ৪০০ ঠাডো বন্দীকে মুক্ত করেন। এটিই ইতিহাসের প্রথম ব্রিটিশ অভিযান। এরপর কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে। ১৮৯৫ সালে মিজো পর্বতমালা ব্রিটিশ ভারতের অংশে পরিণত হয় এবং তখন থেকে মিজোরাম ও সন্নিহিত অঞ্চলে মাথা শিকারের প্রথা নিষিদ্ধ হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ মিজো পর্বতমালা আসামের অংশে পরিণত হয় এবং লুসাই পার্বত্যজেলার আইজলকে সদর দফতর করা হয় । ব্রিটিশ শাসনামলে প্রায় ৬০ জন গোষ্ঠীপ্রধান ছিলেন। যিশুর বাণী নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমনের পর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এখানকার অধিকাংশ মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় গোষ্ঠীপ্রধানদের সংখ্যা দু'শো ছাড়িয়ে যায়। মিজো ইউনিয়নের ব্যানারে মিজো শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উপজাতীয় প্রধান প্রথা বিলোপের দাবি জানায়। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে আসাম-লুসাই জেলা (প্রধানদের অধিকার অধিগ্রহণ) আইন ১৯৫৪ অনুযায়ী ২৫৯জন প্রধানের বংশগত অধিকার রদ হয়। মিজো অঞ্চলের গ্রাম-আদালতগুলি আসামের অন্যান্য অংশের সঙ্গে পুনর্বণ্টন করা হয়। এ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীভূত আসাম-শাসনে গোটা অঞ্চলে অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯৫৯-৬০ সালের দুর্ভিক্ষে সরকারের অপ্রতুল সাড়াদানে অসন্তুষ্ট মিজোরা 'মিজো জাতীয় দুর্ভিক্ষ ফ্রন্ট' গঠন করে ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৬১ সালে সংগঠনটি মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) নামে আত্মপ্রকাশ করে। ষাটের দশকে এমএনএফ-এর প্রতিবাদ ও সশস্ত্র বিদ্রোহ চলতে থাকে। ১৯৭১ সালে সরকার মিজো পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেয়, যা ১৯৭২ সালে ফলপ্রসু হয়। এমএনএফ-এর সঙ্গে সরকারের 'মিজোরাম শান্তি চুক্তি' (১৯৮৬) স্বাক্ষরের ফলে ১৯৮৭ সালে মিজোরামকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মিজোরাম রাজ্য ও লোকসভায় ২টি আসন পায়।

ভূগোল

স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্ব ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের ৭২২ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে মায়ানমার ও বাংলাদেশের সঙ্গে, উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত রয়েছে মণিপুর, আসাম ও ত্রিপুরার সঙ্গে। এটি ভারতের পঞ্চম ক্ষুদ্রতম রাজ্য– ক্ষেত্রফল ২১ হাজার ৮৭ বর্গকিমি। এটি ২১°৫৬' উত্তর থেকে ২৪°৩১' উত্তর এবং ৯২°১৬' পূর্ব থেকে ৯৩°২৬' পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রায় মধ্যাঞ্চল দিয়ে কর্কটক্রান্তি চলে গেছে। এর উত্তর-দক্ষিণের সর্বোচ্চ দূরত্ব ২৮৫ কিমি এবং পূর্ব-পশ্চিমের সর্বোচ্চ দূরত্ব ১১৫ কিমি।

মিজোরাম পর্বত, উপত্যকা, নদী ও হ্রদবেষ্টিত বিসর্পিল ভূমি।

রাজধানী আইজল

যব্‌লপুইয়ের ধান খেত

রাজ্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বরাবর বিভিন্ন উচ্চতার প্রায় ২১টি বড় পর্বতমালা রয়েছে– এর মধ্যে এখানে-সেখানে সমতলভূমি। রাজ্যের পশ্চিমের পর্বতমালার গড় উচ্চতা ১ হাজার মিটার (৩ হাজার ৩০০ ফুট)। এগুলিই ক্রমে পুবের দিকে ১৩ শো মিটার পর্যন্ত (৪ হাজার ৩০০ ফুট) উচ্চতায় বেড়েছে। কোন কোন জায়গায় এর উচ্চতা ২ হাজার (৬ হাজার ৬০০ ফুট) মিটারের বেশি। রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত *নীল পর্বত* নামে পরিচিত 'ফংপুই লাং' হচ্ছে মিজোরামের সর্বোচ্চ (২ হাজার ২১০ মিটার বা ৭ হাজার ২৫০ ফুট) শৃঙ্গ। রাজ্যের ৭৬ শতাংশ বনাঞ্চল, ৮ শতাংশ কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী এবং ৩ শতাংশ বন্ধ্যা বা অকর্ষণযোগ্য ভূমি– বাকি জমিতে কৃষিকাজ হয়। জুম চাষে নিরুৎসাহিত করা হলেও এটি এখনও মিজোরামের কৃষি ব্যবস্থা হিসেবে রয়ে গেছে।

পশ্চিম মিজোরামের সাধারণ ভূতত্ত্ব সুরমা গ্রুপ ও টিপাম ফর্মেশনের পৌনঃপুনিক নিওজিন পাললিক শিলা অর্থাৎ মাড স্যান্ড সিল্টস্টোন ও চূনাপাথরের বিরল পকেট সমন্বয়ে গঠিত। পূর্বাঞ্চলীয় অংশ বরাইল গ্রুপের। মিজোরাম ভূকম্প জোন ৫-এ অবস্থিত। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের মতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে মিজোরামও ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ।

মিজোরামের সর্ববৃহৎ নদীর নাম ছিমটুইপুই। এটি কলডান বা কলডাইন নামেও সমধিক পরিচিত। এটি বর্মার ছিন রাজ্যে উৎপন্ন হয়ে মিজোরামের দক্ষিণাঞ্চলীয় সাইহা ও লংট্‌লাই জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার বর্মার রাখাইন রাজ্যে ফিরে গেছে। রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যবহৃত নদীগুলি হচ্ছে লাং, টুট, টুইরিয়াল ও টুইবাওল যা উত্তরাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাছাড় জেলার বরাক নদীতে গিয়ে মিশেছে। নদীগুলির সার্বিক অভিমুখ দক্ষিণ দিকে।

মিজোরামের সর্ববৃহৎ হ্রদ *পালাক* ৩০ হেক্টর (৭৪ একর) এলাকাজুড়ে দক্ষিণাঞ্চলের সাইহা জেলায় অবস্থিত। কোন ভূমিকম্প বা বন্যায় এটি তৈরি হয়েছিল বলে লোকবিশ্বাস। স্থানীয় লোকদের ধারণা, হ্রদের গভীরে একটা গোটা গ্রাম ডুবে আছে। আইজলের ৮৫ কিমি দূরত্বে অবস্থিত *তাম ডিল* হ্রদ একটি প্রাকৃতিক হ্রদ। কিংবদন্তী আছে, এখানে একটি বড় সরিষা গাছ ছিল, গাছটি কাটা হলে গাছের রস গড়িয়ে বড় পুকুরের সৃষ্টি হয়। '*তাম ডিল*' মানে হচ্ছে 'সরিষা গাছের হ্রদ'। এখন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ও অবকাশ কেন্দ্র। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মিজো ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ্রদ *রিহ্ ডিল* ভারত-বর্মা সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দূরে বর্মায় অবস্থিত। মিজোদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর আত্মা এই হ্রদ পেরিয়ে *পিয়ালরালে* (স্বর্গে) যায়। তিনদিকে আন্তর্জাতিক ও একদিকে দেশীয় সীমান্ত থাকায় মিজোরামকে 'পেনিন্‌সুলা স্টেট'ও বলা হয়ে থাকে।

জলবায়ু

মিজোরামের জলবায়ু মৃদু– গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ২০°-২৯° সেলসিয়াস (৬৮°-৮৪° ফারেনহাইট) ও শীতে ৭°-২২° সেলসিয়াস (৪৫°-৭২° ফারেনহাইট) পর্যন্ত হয়ে থাকে। মওসুমি বায়ুর প্রভাবে মে থেকে সেপ্টেম্বরে ভারী ও শুষ্ক মৌসুমে হালকা বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। আবহাওয়া বাষ্পীয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় থেকে বাষ্পীয় উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫৪ সেন্টিমিটার (১০০ ইঞ্চি)। আইজলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১৫ সেন্টিমিটার (৮৫ ইঞ্চি), অন্যদিকে লুংলেইয়ে ৩৫০ সেন্টিমিটার (১৪০ ইঞ্চি)। এখানে ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিধসে আবহাওয়াগত জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

জীববৈচিত্র্য

মিজোরামের ৯০.৬৮ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ লাখ ৯৪ হাজার হেক্টর জমি বনাচ্ছাদিত– এটি ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বনভূমি আচ্ছাদিত রাজ্য। মিজোরামের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আধা-চিরহরিৎ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বাষ্পীয় পর্ণমোচী, উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বড়পাতার গাছ-গাছালিসমৃদ্ধ পর্বত ও উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পাইন বন সর্বত্র চোখে পড়ে। এ রাজ্যের সর্বত্র প্রচুর বাঁশ জন্মে– প্রায় ৪৪ শতাংশ জমিতে বাঁশ দেখা যায়।

জুম চাষ বনাঞ্চলের জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ জুম চাষের জন্য পাহাড়ি জমিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে জমির সার্বিক ক্ষতি হয়। সরকার জুম চাষের পরিবর্তে আনারস ও কলাচাষের মত উদ্যান চর্চায় উৎসাহিত করছে।

মিজোরামে ৬৪০ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। মিজোরামের বনাঞ্চলে ২৭ প্রজাতির বিশ্বব্যাপী হুমকির সম্মুখীন এবং ৮ প্রজাতির বিশেষ হুমকির সম্মুখীন পাখি দেখা যায়। মিজোরামের বনে স্লো লোরিস, রেড সেরো (রাজ্যের জাতীয় জন্তু), গোরাল, বাঘ, চিতা, মেঘা চিতা, চিতা বিড়াল ও এশীয় কালো ভল্লুক প্রভৃতি জীবজন্তু এবং বানরের মধ্যে মোটা লেজবিশিষ্ট মেকাক, হুলক গিবন, ফাইরি-র পাতা বানর ও টুপিওয়ালা লেঙ্গুর দেখা যায়। এটি সরীসৃপ, মাছ ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীরও আবাসভূমি।

মিজোরামে ২টি জাতীয় উদ্যান ও ৬টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। নীল পাহাড় (ফংপুই) জাতীয় উদ্যান ও মার্লেন জাতীয় উদ্যান এবং ডামপা বাঘ সংরক্ষণ (বৃহত্তম) কেন্দ্র, লেংটেং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, জেংপুই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, তায়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, খাওংলুং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও ঠোরাংলাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।

জনমিতি

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মিজোরামের জনসংখ্যা ১০ লাখ ৯১ হাজার ১৪জন– এর মধ্যে পুরুষ ৫ লাখ ৫২ হাজার ৩৩৯জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫২জন। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মিজোরামের সাক্ষরতার হার ৯১.৩৩ শতাংশ যা জাতীয় গড় ৭৪.০৪ শতাংশের অনেক বেশি।

ষোড়শ শতাব্দীর দিকে মিজোদের প্রথম দলটি টিয়াউ নদী পার হয়ে মিজোরামে এসে বসতি স্থাপন করে। এদের বাঙালিরা 'কুকি' বলে সম্বোধন করত। কুকি মানে ভেতরের দূরতিগম্য পাহাড়ের বাসিন্দা। পুরনো কুকিদের মধ্যে বিয়াতে ও হ্রাংখোল উপজাতির লোক ছিল। দ্বিতীয় দলে ছিল লুসেই, পাইতে, লাই, মারা, রালতে, হ্‌মার, ঠাডোউ, শেনডু ও

নেপটুনিয়া ওলেরাসিয়া

স্থানীয় পাখি সিরমাটিকাস হুমিয়ে

অন্যান্যরা। এইসব উপজাতীয়রা নানা গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বর্মা ও বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ হ্মাররা ঠিয়েক, ফাইরিয়েম, লুংটাউ, দারংগন, খওবাং, জোটে ও অন্যান্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছে। অনেক সময় এদের ভাষায়ও সামান্য পরিবর্তন ঘটে যায়। মিজোরামে ব্রু (রিয়াং), চাকমা, তঞ্চঙ্গা, ছিন প্রভৃতি উত্তর আরাকান পর্বতের অ-কুকি উপজাতি রয়েছে, কিছু আছে আর্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত। নেই মেনাশে উপজাতীয়রা ইহুদিদের উত্তরসূরী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নেপালি গোর্খাদের আইজল ও মিজোরামের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করা হয়।

২০০১ সালের হিসেব অনুযায়ী মিজোরামে মিজো (৭৩.২ শতাংশ), চাকমা (৯.০১ শতাংশ), মারা (৩.৮২ শতাংশ), লাই (২.৭ শতাংশ), ত্রিপুরী (১.৯ শতাংশ), হ্মার (১.৫ শতাংশ), পাইতে (১.৫ শতাংশ) ও অন্যান্য (৬.৩৭ শতাংশ) ভাষায় কথা বলে। মিজো হচ্ছে সরকারি ভাষা এবং ব্যাপক ব্যবহৃত কথ্যভাষা। তবে শিক্ষা, প্রশাসন, আনুষ্ঠানিকতা ও সরকার পরিচালনায় ইংরেজি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। লুসেই মিজোরামের প্রথম ভাষা যা মিজো ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। লোরেইন ও স্যাভিজ নামে দুই খ্রিস্টান মিশনারি ১৮৯৫ সালের দিকে রোমান লিপির আদলে মিজো ভাষার প্রথম বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। মিজো বর্ণমালায় ২৫টি বর্ণ: *A, AW, B, CH, D, E, F, G, NG, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, T, U, V, Z*। মিজো ভারতে সরকারি মর্যাদা (রাজ্য পর্যায়ে) পাওয়া অন্যতম ভাষা। নেপালি অধিবাসীরা নেপালি ভাষায় কথা বলে।

২০১১ সালের জনগণনা হিসেব অনুযায়ী মিজোরামে খ্রিস্টান (৮৭.১৬ শতাংশ), বৌদ্ধ (৮.৫১ শতাংশ), হিন্দু (২.৭৫ শতাংশ), ইসলাম (১.৩৫ শতাংশ), জৈন (০.০৩ শতাংশ), শিখ (০.০৩ শতাংশ) ও অন্যান্য (০.১৬ শতাংশ) মানুষের বসবাস।

মিজো খ্রিস্টানদের অধিকাংশই প্রেসবিটারিয়ান। চাকমা থেরবাদী বৌদ্ধ জনসংখ্যা সাড়ে আট শতাংশ– এরাই মিজোরামের সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। এরপরে আছে হিন্দু– ২.৭ শতাংশ। এখানে বাইবেলে কথিত মেনাশে জাতির উত্তরসূরী অধুনালুপ্ত নেই মেনাশে ইহুদি উপজাতির দাবিদার ইহুদি ধর্মগ্রহণকারী কয়েকহাজার জাতিগত মিজো রয়েছে।

রাজনীতি

'রাম' নামে পরিচিত গ্রামের জমি হচ্ছে উপজাতীয় প্রধানের সম্পত্তি। ষোড়শ শতকে গ্রামপ্রধান প্রথা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। প্রত্যেকটি গ্রামই যেন এক-একটি রাজ্য, প্রধানকে বলা হত 'লাল'। শাসন বংশানুক্রমিক এবং কোন লিখিত আইন ছিল না। ১৮৯৫ সালের দিকে মিজো ভাষার বর্ণমালা উদ্ভাবিত হয়। কজেই তখন আইন লিখিত হবার উপায় ছিল না।

১৮৯০-এর দশকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার পর মিজোরামের উত্তরাংশ আসামের লুসাই পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণাংশ বেঙ্গল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণাংশ বেঙ্গল থেকে আসামের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা গোষ্ঠী প্রধান ও মিজো প্রথা বলবৎ রাখে। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫২ সালে এ অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর হয় এবং মিজো জনগণ তাদের জন্য নিজস্ব আইন প্রণয়ন করে। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে অঞ্চলটি আসাম রাজ্যের মিজো জেলা নামে অভিহিত হয়। এবছরই বংশানুক্রমিক প্রধান প্রথা বিলোপ করে গ্রাম আদালত/পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই বছর যুব মিজো সমিতি গঠিত হয় যা এখনও মিজোরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

লুসাই পার্বত্য স্বায়ত্তশাসন জেলা পরিষদ ও মিজো ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ত্রিপুরা ও মণিপুরের মিজো-অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে আসাম জেলা পরিষদের সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য স্টেটস্ রি-অর্গানাইজেশন কমিশন (এসআরসি)-র কাছে আবেদন করে। উত্তর-পুবের উপজাতীয় নেতারা এসআরসি-র সুপারিশে অসন্তোষ প্রকাশ করে ১৯৫৫ সালে আইজলে মিলিত হয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ট্রাইবাল ইউনিয়ন (ইআইটিইউ) নামের এই দলটি আসামের পার্বত্য জেলাগুলির সমন্বয়ে একটি পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে।

১৯৮৬ সালের জুন মাসে মিজোরাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং মিজোরাম ভারতের ২৩তম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। মিজোরাম হাই কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিধানসভা আসন সংখ্যা ৪০। গ্রাম পরিষদ হচ্ছে মিজোরামের গণতন্ত্র ও নেতৃত্বের তৃণমূল ভিত্তি। জাতিগত উপজাতি অধ্যুষিত মিজোরামে ৩টি স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ রয়েছে– এগুলি হচ্ছে: বাংলাদেশ-সীমান্তবর্তী দক্ষিণাঞ্চলের *চাকমা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ*, দক্ষিণাঞ্চলের লাই জনগণের জন্য *লাই স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ* এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় কোণের মারা জনগোষ্ঠীর জন্য *মারা স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য জেলা পরিষদ*। মিজোরামে মোট ৮টি জেলা– জেলার দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনারের হাতে ন্যস্ত।

অর্থনীতি

মিজোরামের গড় রাজ্য উৎপাদন (জিএসডিপি) ২০১১-১২ সালে ছিল ৬ হাজার ৯৯১ কোটি রুপি (একশো কোটি ডলার)। ২০০১-১৩ সালে জিএসডিপি-র হার ছিল প্রায় ১০ শতাংশ। বাংলাদেশ ও মায়নমারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা থাকায় এটি ভারতে আমদানির এবং ভারত থেকে রপ্তানির জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। রাজ্যের জিএসডিপি-র প্রবৃদ্ধিতে কৃষির অবদান সর্বাধিক। সেবাখাতের জিএসডিপি গত দশকে ৫৮-৬০ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। জাতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২০.৪ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে, যেখানে ভারতের গড় ২১.৯ শতাংশ। গ্রামে দারিদ্র্য আরো বেশি– ৩৫.৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে।

মিজোরামে সাক্ষরতার হার প্রায় ৯০ শতাংশ এবং ইংরেজির ব্যবহার ব্যাপক। রাজ্যে মোট ৪ হাজার ৩০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, যার ৯২৭ কিমি উচ্চমানের জাতীয় মহাসড়ক ও ৭০০ কিমি রাজ্য মহাসড়ক। মিজোরাম নৌপথ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের জন্য কলডাইন নদীর উন্নয়ন

লালমুয়াল স্টেডিয়াম

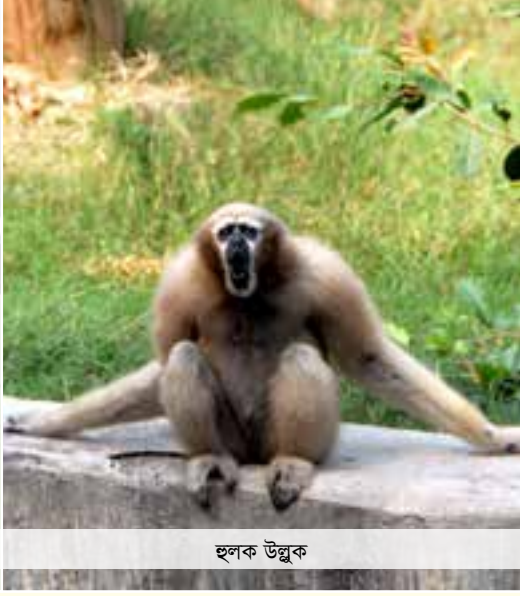

হুলক উল্লুক

করছে। রাজধানী আইজলে মিজোরাম বিমানবন্দর অবস্থিত। জলবিদ্যুৎ সম্ভবনা সত্ত্বেও মিজোরামে বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে। কৃষির পর মানুষ তাঁত ও উদ্যানশিল্পে নিয়োজিত। পর্যটন ক্রমশ বাড়ছে। ২০০৮ সালে প্রায় ৭ হাজার কোম্পানিকে পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত দেখা যায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে রাজ্য সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপন করেছে।

মিজোরামের ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ কর্মক্ষম জনসংখ্যা কৃষিকাজে নিয়োজিত। কৃষি ঐতিহ্যগতভাবে মিজোরামের জীবনধারণের পেশা। বাণিজ্য, প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির গুরুত্ব অস্বীকার করে কৃষিকে কোন একটি পরিবারের খাদ্য তৈরির অবলম্বন হিসেবে দেখা হয়। উৎপাদনের গড় মূল্যে ধান মিজোরামের প্রধানতম শস্য। এরপরে আছে ফলের উৎপাদন। তারপর আছে আচার ও মসলার অবস্থান।

১৯৪৭-এর আগে কৃষিকাজে জুম পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। রাজ্য সরকার উৎসাহ না দেখানোয় এর চর্চা হ্রাস পাচ্ছে। ২০১২ সালের রিপোর্টে দেখা যায় মিজোরামে জুম চাষের এলাকা প্রায় ৩০ শতাংশ– বড় অংশ (৫৬-৬৩ শতাংশ) ব্যবহৃত হয় ধান উৎপাদনে। বিপুলসংখ্যক শ্রমিক পাওয়া গেলেও জুম ও অজুমচাষে উৎপাদন বেশি নয়। ভারতের প্রতি একরে গড় ধান উৎপাদনের প্রায় ৭০ শতাংশ উৎপাদিত হয় মিজোরামে। ভারতের সর্বোচ্চ উৎপাদন প্রতি একরে ৩২ শতাংশ। ফলে প্রতিবছর প্রয়োজনের মাত্র ২৬ শতাংশ ধান মিজোরামে উৎপাদিত হয় এবং সঙ্গত কারণেই অন্যান্য রাজ্য থেকে ঘাটতি পূরণ করতে হয়।

উদ্যান ও ফুলচাষে মিজোরাম অনেক এগিয়ে। অ্যান্থুরিয়াম (বছরে ৭০ লাখেরও বেশি) ও গোলাপ উৎপাদন ও রপ্তানিতে বিশ্বে মিজোরামের অবস্থান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কলা, আদা, হলুদ, প্যাশন ফল কমলা ও চৌচৌ উৎপাদন ও দেশজ সরবরাহে মিজোরামের সুনাম আছে। মিজোরামের কৃষি উৎপাদন খুবই কম। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও মাটির জল ধারণক্ষমতা না থাকায় এবং সেচ অবকাঠামোর অপ্রতুলতায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। তবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কম হওয়ায় সবজি ও ফল -মূলের জৈব চাষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

মিজোরাম ভারতের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বাঁশ উৎপাদনকারী রাজ্য। ২৭ প্রজাতির বাঁশ থেকে ভারতের বাণিজ্যিক চাহিদার ১৪ শতাংশ মিজোরাম থেকেই সরবরাহ করা হয়। রাজ্যের গড় উৎপাদনের ৫ শতাংশ আসে বন থেকে। মিজোরামে বছরে ৫ হাজার ২০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। রেশম চাষ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প। ৩০০ মিজো গ্রামের প্রায় ৮ হাজার পরিবার এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত।

মিজোরামে ৭০ লক্ষ টনের বেশি অ্যান্থুরিয়াম উৎপন্ন হয় এবং স্থানীয় বাজার ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও জাপানে রপ্তানি হয়। মিজোরামের মেয়েরা এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত।

যোগাযোগ অবকাঠামোর অপ্রতুলতা মিজোরামের শিল্প বিকাশের অন্তরায়। তাছাড়া আছে বিদ্যুৎ, মূলধন, টেলিযোগাযোগ ও রপ্তানি বাজারে প্রবেশাধিকারের সমস্যা। রাজ্যের দুই শিল্প এলাকার নাম জুয়াংটুই ও কোলাসিব। মিজোরামের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আরেকটি সফট্ওয়্যার প্রযুক্তি পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার খওনুয়ামে ভারত-মায়ানমার সীমান্ত বাণিজ্য উপশহর প্রতিষ্ঠাকল্পে ১২৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে।

খ্রিস্টান মিশনারিরা ১৮৯৮ সালে মিজোরামের প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬১ সালে রাজ্যের সাক্ষরতার হার ছিল ৫১ শতাংশ, ২০১১ সালে এ হার ৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ভারতে কেরালার পরই মিজোরামের অবস্থান। রাজ্যের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩ হাজার ৮৯৪। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত প্রাথমিকে ১ ঃ ২০, মধ্য বিদ্যালয়ে ১ ঃ ৯, উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ ঃ ১৩ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ১ ঃ ১৫। মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি পেশাগত প্রতিষ্ঠানসহ ২৯টি স্নাতক-পূর্ব বিভাগ রয়েছে। অন্যান্য বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মিজোরাম, আইসিএফএআই ইউনিভার্সিটি মিজোরাম, কলেজ অফ ভেটেরিনারি সায়েন্সস এন্ড এনিম্যাল হাসবেন্ড্রি, সেলেসিহ্, আইজল এবং রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিকেল এন্ড নার্সিং আইজল।

মিজোরাম বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর নয়। বিদ্যুৎ চাহিদা ১০৭ মেগাওয়াট, অথচ উৎপাদিত হয় মাত্র ২৯.৩৫ মেগাওয়াট। ফলে জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হয়। ২০১০ সালে মিজোরামে জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা নিরূপণ করা হয় ৩৬০০ মেগাওয়াট, ২০১২ সালে প্রায় ৪৫০০ মেগাওয়াট। এর যদি অর্ধেকও বাস্তবায়িত হয়, মিজোরামের প্রত্যেকটি ঘরে এবং প্রতিটি শিল্প কারখানায় ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া এবং জাতীয় গ্রিড থেকেও অর্থ উপার্জন সম্ভব হবে। বায়োস্ফিয়ার বজায় রেখে টুইভাই, টুইভাওল, টুট, সেরলুই, টুইরিয়াল, কলডাইন, টুইচ্যাং, টুইপুই, টিয়াউ ও ম্যাট নদী হাইডেল প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত। এসব বড় নদী ছাড়াও মিজোরামে ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উপযোগী অসংখ্য ছোট নদী রয়েছে।

২০১২ সালে মিজোরামে সড়ক নেটওয়ার্ক প্রায় ৮ হাজার ৫০০ কিমি– এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৮৭১ কিমি, রাজ্য মহাসড়ক ১ হাজার ৬৬৩ কিমি ও জেলা সড়ক ২ হাজার ৩২০ কিমি। এ-সব সড়ক দিয়ে মিজোরামের ২৩টি শহর ও ৭৬৪টি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ)-৫৪ দিয়ে শিলচর দিয়ে আসাম, এনএইচ-১৫০ দিয়ে মণিপুরের ইম্ফল, এনএইচ-৪০ দিয়ে ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হচ্ছে। বর্মার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের প্রস্তাব রয়েছে।

আইজলের কাছে লেংপুই বিমানবন্দরের রানওয়ে ৩ হাজার ১৩০ ফুট লম্বা, যার এলিভেশন ১ হাজার ফুট। আইজল থেকে কলকাতা ৪০ মিনিটের উড়ান। আসামের শিলচর হয়ে ২০০ কিমি সড়কপথে আইজলে পৌঁছনো যায়।

বৈরাবিতে একটা রেলস্টেশন হয়েছে তবে তা প্রাথমিকভাবে পণ্য চলাচলের জন্য। মিজোরামের নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে আসামের শিলচর। আইজল থেকে বৈরাবির দূরত্ব প্রায় ১১০ কিমি, শিলচরের দূরত্ব ১৮০ কিমি।

পবন হংস নমে একটি হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়েছে যা আইজলের সঙ্গে লুংলেই, লংট্লাই, সাইহা, চোয়াংটে, সার্চিপ, চাম্ফাই, কোলাসিব, খাওজওল, মানিট ও নান্টাইয়ের সংযোগ সহজতর করেছে।

অর্কিড

অ্যান্থুরিয়াম

মানিটের পাম বন

মিজোরাম তার বৃহত্তম নদী ছিমটুইপুই দিয়ে বর্মার আকিয়াব সিট্টে বন্দরের সঙ্গে একটি জলপথ তৈরির চেষ্টা করেছে। নদীটি বর্মার রাখাইন রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের আকিয়াবে পড়েছে, এখানেই জনপ্রিয় বন্দর সিট্টে অবস্থিত। বর্মার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে ভারত এই অভ্যন্তরীণ নদীপথ সৃজনে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। মিজোরাম থেকে প্রায় ১৬০ কিমি দূরে বর্মার উত্তর উপকূলের সিট্টে বন্দর উন্নয়নে ভারত সরকার 'কলডন মাল্টি-মোর্ডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' নামে প্রকল্পে ইতোমধ্যে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করছে।

সংস্কৃতি

১৮৯০-এর দশকে খ্রিস্টানদের আগমনের পর মিজো উপজাতীয়দের সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। মিজো জনগণ এখন পুরনো উপজাতীয় প্রথা ও চর্চা ছেড়ে ক্রিসমাস, ইস্টার ও অন্যান্য খ্রিস্টীয় পালা-পার্বণ পালন করে থাকে।

মিজোরা *হ্নাট্লাং* (সবাই মিলে সমাজের কাজ করা) ও *ট্লম্নগাইনায়* (আত্মোৎসর্গ) বিশ্বাসী। খ্রিস্টীয় চর্চার আগে প্রাচীন মিজো উপজাতীয়দের কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল। যেমন:

যব্লবুক: গোষ্ঠীপ্রধানের বাড়ির নিকটবর্তী স্থান প্রতিরক্ষা শিবির হিসেবে ব্যবহৃত হত। গ্রামীণ জীবনের এই কেন্দ্র ছিল অবিবাহিত যুবকদের সম্মিলনস্থল।

পাঠিয়ান: মিজো ঈশ্বর– যার পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়। অশুভ শক্তিকে বলা হয় *রামহুয়াই*।

নুলা-রিম: প্রচীন সাংস্কৃতির বিবাহ পদ্ধতি। মিজোরামে প্রাক-বিবাহ যৌনতা ও বহুগামিতার প্রচলন ছিল। একজন নারী বা পুরুষের বহু সঙ্গী/সঙ্গিনী থাকত। নারীটি গর্ভবতী হয়ে পড়লে পুরুষটিকে খোঁজা হত বিয়ে করা কিংবা *সাওনমান* নামে বড় অংকের টাকা পরিশোধের জন্য। নারীটির বাবা-মা এ রকম সম্পর্কের খোঁজ পেলে *খুমপুইকাইমান* (যৌতুক) দাবি করত। যদিও বিবাহ-পূর্ব যৌনতার চল ছিল, তবু বিয়ের আগে কোন মেয়ে কুমারী আছে জানা গেলে তাকে সমীহ করা হত।

পাঠলায়ি: বিবাহিত পুরুষ যার বিবাহ-বহির্ভুত একাধিক সম্পর্ক রয়েছে।

রামরিলেখা: গোষ্ঠীপ্রধানের কথিত এলাকা চিহ্নিতকরণ সীমারেখা– এটি প্রধানের বংশানুক্রমিক নিজস্ব জমি। উপজাতি ও গ্রাম এ জমিতে ফসল ফলাত।

আধুনিক মিজোরামের সমাজ জীবন গির্জাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

মিজোরামের ঐতিহ্যবাহী বাদ্রযন্ত্র হচ্ছে ডারখুয়াং বা জামলুয়াং। চাকমা উপজাতির ঐতিহ্যবাহী বাঁশির নাম ভাজি। চাকমা যুবকরা তাদের প্রেমিকাদের আকৃষ্ট করতে ভাজি বাজায়।

জুম চাষের সময় মিজোরামে উৎসব হত। সম্প্রদায়গত উৎসবকে স্থানীয় ভাষায় বলে কুট। ছোট বড় অনেক কুট আছে। যেমন: *চাপচার কুট, ঠালফাভাং কুট, মিম কুট* ও *পওল কুট*। বসন্তোৎসবের নাম *চাপচার কুট*। খেত তৈরির জন্য জমিতে আগুন দেওয়ার সময় এ কুট অনুষ্ঠিত হত। জুম জমিতে নিড়ানির সময় হত *ঠালফাভাং*। প্রথম ভূট্টা কাটার সময় পূর্বপুরুষদের স্মৃতিতর্পণে অনুষ্ঠিত হত *মিম কুট*। ফসল কাটা শেষ হলে নতুন বছরের শুরুতে হত *পওল কুট*। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের প্রসারে এসব উৎসব ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে। মিজো জনগণ ১৯৭৩ সালে *চাপচার কুট* পুনঃপ্রবর্তন করে।

বিজু হচ্ছে চাকমাদের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব। সাধারণত এপ্রিল মাসে ৩ দিনের উৎসব– অবশ্য চলে সপ্তাহব্যাপী। উৎসবের সময় চাকমা তরুণ-তরুণীরা বর্ণিল সাজ-পোশাক সজ্জিত হয়ে বিজু নাচে অংশ নেয়।

চেরো হচ্ছে মেঝেতে বাজনার তালে তালে বাঁশ ওঠা-নামার ফাঁকে পা রেখে নাচা। এ নাচে খুব সমন্বয় ও দক্ষতার প্রয়োজন।

খুয়াল্লাম নাচ হত শীতের সন্ধ্যায় চোলাই খেতে জড় হাওয়া উঠোনে– সবাই গোল হয়ে বসে, মাঝখানে দুই বা ততোধিক নারী-পুরুষের নাচ।

চাই নাচ হত চাপচার কুটের সময়। নাচের সময় মেয়েটি দু'হাতে পুরুষটির কোমর জড়িয়ে ধরে, আর পুরুষটি মেয়েটির ঘাড়ে দু'হাত রেখে নাচে।

মিজোরা গান ভালবাসে। কোন বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই অক্লান্তভাবে তারা সারারাত মৃদুস্বরে গান গাইতে পারে। গানের সময় হাতে তালি দেয়। গির্জার ভেতর তারা খুয়াং নামে কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরি স্থানীয় ঢাক বাজায়।

সূত্র **উইকিপিডিয়া**
অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়

আইজল প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

অনুবাদ গল্প

সুলতানের ব্যাটারি

অরভিন্দ আদিগা

দরগার সাদা ডোমের দিকে লোকটি এগিয়ে চলেছে। বগলের নিচে একটা ভাঁজ করা কাঠের টুল। দরকার হলে যেটাকে খুলে তার উপরে বসা যায়। আরেক হাতে ছবির এ্যালবাম এবং সাত বোতল সাদা ট্যাবলেট ভর্তি ওষুধ। গন্তব্যস্থলে যেতে চারপাশের ভিক্ষুকগুলোকে দেখেও দেখে না সে। কুষ্ঠরোগীরা কম্বলের উপর বসে আছে– তাদের হাত ও পায়ের বিকলাঙ্গ দৃশ্য সে দেখে না। কেউ ভিক্ষার জন্য বসে আছে চাকা চেয়ারে। কেউ দু'চোখ ঢেকে বসে আছে। যেখানে হাত থাকার কথা সেখানে সিল মাছের ডানার মত কি যেন– এখন ওগুলোই সেই বিকলাঙ্গ মানুষের হাত। একটা সাধারণ পা এবং একটি গাছের গুঁড়ির মত কাটা পা। সে পাছা দুলিয়ে ক্রমাগত বলছে– আল্লাহু! আল্লাহু।

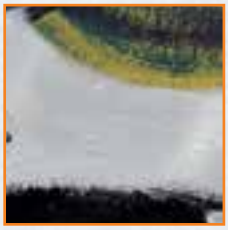

ছবিগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যৌন বিকৃতি ও শরীরের উপরের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেন রতনকারা শেঠি। বলেন পাপ-তাপ একজনকে কি করতে পারে। বলেন কিভাবে এইসব জীবাণু পা থেকে উপরে উঠতে থাকে তারপর একসময় সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। একে একে এরা সব চোখে যায়, নাকে যায়।

এই দুঃখ-দৃশ্যের প্যারেডকে পাশ কাটিয়ে সে চলছে। ভাবখানা এমন এসব দেখে দেখে সে অভ্যস্ত। যেতে যেতে সে এবার সুলতান ব্যাটারি দরগার পেছনে চলে যায়।

এরপর এসে যোগ দেয় সেইসব দোকানির সঙ্গে যারা প্রায় আধমাইল লাইন করে নানা কিছু বিক্রি করছে। মেয়েদের জুতো, তাদের বক্ষবন্ধনী, কিছু কিছু টি শার্টের পাহাড় ঠেলে সে এগিয়ে চলে। টি শার্টে নানা সব শ্রাব্য ও অশ্রাব্য কথা লেখা। একটায় লেখা– ফাকিং নিউইয়র্ক সিটি। এরপর নানা সব নকল রঙ্গিন চশমা, নানা ধরনের জুতো– সবগুলোই নকল। আডিডাস জুতো আর নাইক জুতো আসল কিছু নয়। এর সঙ্গে আছে উর্দু ভাষা ও মালয়ালম ভাষার বিশাল ম্যাগাজিনের পাহাড়। সে এবার এসে দাঁড়িয়েছে নাইক আর গুকি নামের দুটো নকল জিনিস বিক্রির দোকানের মাঝখানে।

এরপর টুল পাতে। নিজের দোকান খুলে বসে– যেখানে চকচকে কাপড়ে বড় করে লেখা:

রতনকারা শেঠি
সবাইকে আহ্বান জানায়
যৌন বিজ্ঞানের চতুর্থ সম্মেলনে
হোটেল নিউ হিলটপ প্যালেস, নতুন দিল্লি

যে-সব যুবক দরগার মুসলমানদের কাবাবের দোকানে কাবাব খেতে এসেছে, যে-সব যুবক সমুদ্র দর্শন করবে বলে এসেছে, কেউ কেউ এসেছে দরগায় প্রার্থনা করতে– তারা সবাই রতনকারা শেঠির দোকানের সামনে গোল হয়ে দাঁড়ায়। রতনকারা আরো নানা জিনিস সাজিয়ে সবাইকে দেখতে বলে। সেই ছবির এ্যালবাম এবং তার সঙ্গে সাত বোতল সাদা পিল। এরপর সে বোতলগুলোকে খুব ভাল করে সাজায় যেন এই বোতল সাজানোর উপরই দোকানের কেনা-বেচা নির্ভর করছে। সে আসলে আড় চোখে তাকিয়ে জেনে নিতে চায় ভিড়টা সত্যিই জমেছে কিনা।

কেউ কেউ যুগলে, কেউ একা, কেউ বন্ধুদের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই সব ছবি আর বোতল দেখছে। যেন মনে হয় ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জের মত তারা সব।

এরপর রতনের কাজ হল কথা বলে সবাইকে এসব ওষুধের গুণাগুণের বিষয় ব্যাখ্যা করা। প্রচার করা সজোরে। এরপর যুবকের ভিড় এত বেশি হয় যে কেউ কেউ পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে সেই তরুণ যৌনবিজ্ঞানীকে দেখতে চায়। যিনি তাদের সবার সমস্যার সমাধান করতে পারেন বলে তাদের ধারণা।

এ্যালবাম খুলে প্লাস্টিকে মোড়া ছবিগুলো দেখাতে শুরু করেন তিনি। ছবি দেখে সেই সব দর্শক বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে। ছবিগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যৌন বিকৃতি ও শরীরের উপরের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেন রতনকারা শেঠি। বলেন পাপ-তাপ একজনকে কি করতে পারে। বলেন কিভাবে এইসব জীবাণু পা থেকে উপরে উঠতে থাকে তারপর একসময় সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। একে একে এরা সব চোখে যায়, নাকে যায়। আকাশে সূর্য অকৃপণ। দরগা সেই আলোয় আরো বেশি উজ্জ্বল। জনতা এক একজনকে গুঁতো মেরে সরিয়ে ছবিগুলোর কাছে আসতে চায়। এরপর রতন তার সেই বিশেষ সাদা পিলের বোতল বের করে। খুব জোরে ঝাঁকাতে থাকে বোতলগুলো।

'এইসব বোতলের সঙ্গে দয়াগঞ্জের হাকিম ভগবান দাসের একটা সার্টিফিকেট আপনাদের দেওয়া হবে। তিনি দিল্লির অধিবাসী এবং এইসব ব্যাপারে একেবারে দক্ষ বিশেষজ্ঞ। এই সাংঘাতিক সাদা পিলগুলো আপনাদের সর্বপ্রকার যৌন ব্যাধিকে সারিয়ে তুলবে। দাম মাত্র চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা। আপনাদের পাপের শাস্তির জন্য এই দাম ধার্য করা হয়েছে। জীবনে আবার সুযোগ আসুক। মাত্র চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত রতনকারা শেঠি তার দোকান গুটোয়। সেই টুলটার পাগুলো ভাঁজ করে। তারপর ৫৪ নম্বর বাসে উঠে এবার অন্য এক ব্যবসা শুরু করে। দরগার দোকান এখন বন্ধ করে ও। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এরপর আরো কিছু কাজ থাকে। উপরের দিকে মুখ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। দশ পর্যন্ত গোনে। তারপর ব্যাগ থেকে ব্রোসারগুলো বের করে দেখে। প্রত্যেকটি ব্রোসারের উপরে তিনটি করে ইঁদুরের ছবি। এরপর ব্রোসারগুলোকে তাসের মত সাজিয়ে উপরে তুলে ধরে বলতে থাকে– ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা সবাই জানেন আমরা এক ভয়ানক ইঁদুরদৌড় প্রতিযোগিতায় জীবনপাত করে চলেছি। আপনাদের সন্তান কিভাবে বেঁচে থাকবে, কিভাবে একটা চাকরি সংগ্রহ করবে, সেই নিয়ে আমি জানি আপনাদের ভাবনার শেষ নেই। কারণ আজকের জীবন আর কিছু নয় কেবল র‍্যাট রেস বা ইঁদুরের প্রতিযোগিতা। এইসব পুস্তিকা সেইসব ইঁদুর প্রতিযোগিতায় কিভাবে আপনারা টিকে থাকবেন তারই উত্তর, টিকে থাকবার প্রামাণ্য দলিল। ওরা কি করে চাকরি পাবে? পেতে কি করতে হবে সে-সব উপায় লেখা আছে এখানে। হাজার হাজার সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর লেখা আছে এই পুস্তিকায়। যে-সব জানা দরকার। কারণ সরকারি বা অন্য যে কোন কাজের জন্য এইসব প্রশ্নোত্তর জানা জরুরি। ব্যাংকে চাকরি পেতে চাইলে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে, পুলিসের চাকরি পেতে গেলেও একই ব্যাপার। এরপর সে খুব জোরে শ্বাস টানে। বলে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি– মুঘল সম্রাটের দুটো রাজধানী ছিল। একটা দিল্লি, আরেকটার নাম কি? ইউরোপের চারটি রাজধানী একটি নদীর উপরে। সেই নদীর নাম কি? জার্মানির প্রথম রাজার নাম কি? এঙ্গোলার মুদ্রার কি নাম? ইউরোপের একটি শহর তিনটি সাম্রাজের রাজধানী। শহরটির নাম করুন। মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সঙ্গে দুইজন মানুষের নাম জড়িত আছে। একজন ন্যাথুরাম গড্‌সে, অন্যজন কে? আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা কত?

হাতে সেইসব পুস্তিকা নিয়ে লোকটি বাসের দুলনিতে ঝুলতে ঝুলতে ক্রমাগত এইসব বলছে। একজন লোক একটা পুস্তিকা কেনে, বিনিময়ে তাকে একটি টাকা দেয়। একসময় এই ব্যবসা বন্ধ করে বাস একটু থামতেই সে নেমে পড়ে।

একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাসের জন্য। রতন তাকে ছয় রংয়ের একটি কলম বিক্রি করতে চায়। প্রথমে বলে– একটি কলমের দাম এক টাকা। তারপর বলে– দুটো কলম পাওয়া যাবে এক টাকায়। অবশেষে বলে– এক টাকায় পাওয়া যাবে তিনটি কলম। লোকটি বলছে সে এসব কিছু কিনবে না কিন্তু বুঝতে পারে মুখে বললেও দেখার ইচ্ছা আছে ভেতরে ভেতরে। এরপর আরেকটা জিনিস বেরোয় রতনের থলে থেকে যা বাচ্চাদের জন্য খুবই মজার। এরপর বের করে জ্যামিতি করবার সেট। লোকটা শেষপর্যন্ত তিন টাকা দিয়ে জ্যামিতির সেটটা কেনে।

এরপর সুলতান ব্যাটারির রাস্তা ছেড়ে সে চলে সল্ট মার্কেটের দিকে।

বাজারে গিয়ে পকেট থেকে কিছু ভাংতি নিয়ে সেগুলো ঠিক করতে থাকে। এরপর সেখান থেকে খুচরো পয়সা নিয়ে সে কেনে এক প্যাকেট বিড়ি। তারপর সেই বিড়ির প্যাকেটটাকে সুটকেসে রাখে।

দাঁড়িয়ে আছ কেন? বিড়ি কেনার পর ভাংতি পয়সা তোমাকে দেওয়া হয়েছে। বলে দোকানের নতুন এক সেলসম্যান।

দাঁড়িয়ে আছি কেন? যখন আমি বিড়ি কিনি আমাকে দুই প্যাকেট ডালও দেওয়া হয়। এভাবেই চলে আমার বিড়ি কেনা। তুমি নতুন, তাই কিছু জানো না।

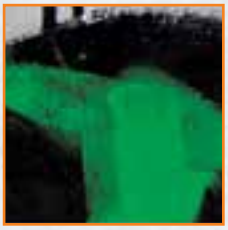

ছেলেটার মনে হয় পেশাব হয়ে গেছে। সে তার পুরুষাঙ্গ ধরে একটু নাড়া দেয় তারপর ফিরে আসতে চায়। কিন্তু খানিক পরেই মনে হয় ছেলেটা কিসের ভয়ে যেন একেবারে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। তারপর মাথাটা একটু পিছে ঠেলে সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। যেমন করে একজন ডুবন্ত মানুষ নিঃশ্বাস নেয়।

বাড়িতে ঢোকার আগে রতন ডালের প্রথম প্যাকেট খুলতেই একদল কুকুর এসে সব ডাল চেটেপুটে খেয়ে এরপর যেখানে ডাল পড়েছিল সেই মাটিও কামড়ে খেতে চায়। তখন রতন ডালের দ্বিতীয় প্যাকেট খোলে। যখন বাড়িতে ঢোকে বুঝতে পারে কুকুরগুলো তখনো ক্ষুধার্ত। কিন্তু তিন প্যাকেট ডাল কিনবার টাকা তার নেই।

বুক টান করতে করতে হাত সোজা করে মাথার উপরে তুলে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সে কোটটা দরজার পাশের হুকে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর চেয়ারে বসে ক্লান্ত রতনকারা শেঠি উচ্চারণ করে– হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ। তারপর পা দুটো টান টান করে মেলে দেয়। যদিও বাড়ির সবাই রান্নাঘরে, তবু টের পেয়েছে রতন বাড়িতে ফিরেছে। আসলে যখন জুতো থেকে দুটো পা বের করে, তার গন্ধ সারা বাড়িতে প্রকট হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েরা কোল থেকে ঝপ করে ফেলে দেয় মেয়েলি ম্যাগাজিনগুলো। এরপর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এমন ভাব দেখায়।

রান্নাঘর থেকে স্ত্রী বেরিয়ে আসে হাতে এক পাত্র জল নিয়ে। তখন রতন বিড়ি পান করতে শুরু করেছে। –আমার মহারানিরা কি এখন কাজে ব্যস্ত? রতন প্রশ্ন করে।

ব্যস্ত আমরা। ঘর থেকে মেয়েরাই উত্তর পাঠায়। মেয়েদের ঠিকমত বিশ্বাস করতে না পেরে সে ঘরে গিয়ে উঁকি দেয়।

ছোট মেয়ে অদিতি ফোটো এ্যালবামকে শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে ফেলছে। দ্বিতীয় মেয়ে রুক্মিণী সাদা পিলগুলো গুনে গুনে ভরছে। মণিকা রুক্মিণীর বড়। সে বোতলে বোতলে লেবেল লাগাতে ব্যস্ত। তিন মেয়েই পরের দিনের ব্যবসার বিভিন্ন জিনিসের তদারকিতে মগ্ন। আর রান্না ঘরে স্ত্রী। থালা-বাসনের ঝন্‌ঝন্ ঠন্‌ঠন্ শব্দ উঠছে। এরপর যখন একটু বিশ্রামে শরীরটা থিতু, দ্বিতীয় বিড়ি ধরিয়েছে, স্ত্রী একটু সাহস করে কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে– আজ নয়টায় জ্যোতিষীর আসবার কথা।

হুঁ। উত্তর দেয় রতন।

এরপর রতন পাটা একটু তুলে ধরে একটা আটকে থাকা বাতাস বের করে দিতে। এরপর পাশের রেডিওটা কোলের উপর নিয়ে বাজনার তালে তালে পায়ে তাল দেয়। যে শব্দগুলো জানে বাজনার তালে তালে সেগুলো উচ্চারণও করে।

ও এখানে। জানায় স্ত্রী।

রতন গান বন্ধ করে। জ্যোতিষী এসে সামনে দাঁড়ায় নমস্তের ভঙ্গিতে হাতদুটো কপালে ঠেকিয়ে। লোকটা রতনের পাশে বসে নিজের গায়ের মোটা শার্টটা খুলে ফেলে। তখন রতনের বউ সেটা নিয়ে স্বামীর কোটের পাশে রাখে। এরপর জ্যোতিষী একটি একটি করে ছেলেদের ফটো ওর সামনে মেলে ধরে। ফটোগুলো একটা বড় এ্যালবামে রাখা আছে।

ছেলেরা ভালই। বলে রতন। এই ছেলেটার বাবা কি করে? প্রশ্ন করে জ্যোতিষীকে।

বাবার একটা দোকান আছে। আতশবাজি বিক্রি করে। দোকানটা আমব্রেলা স্ট্রিটে। ভাল ব্যবসা। ছেলেটা ভবিষ্যতে বাবার দোকানটা পাবে।

নিজের ব্যবসা? রতন একটু অবাক হয়। যেন বেশ একটু খুশি খুশি ভাব তার কণ্ঠে। মনে হয় ইঁদুর প্রতিযোগিতায় লোকটা বেশ একটু এগিয়ে আছে। দোকানে যারা সেলস্‌ম্যানের কাজ করে তাদের চেয়ে অবস্থা ভাল।

মনে হয় রান্নাঘরে স্ত্রী কি যেন ফেলে দিল। রতন যখন সেটা দেখেও দেখে না স্ত্রী আবার কি যেন ফেলে দেয়। রতন রেগে বলে– ব্যাপার কি তোমার?

জন্মকুণ্ডলি। হরসকোপ। কোষ্ঠী। স্ত্রী মিনমিনে গলায় জানায়। কিছু ফেলে দেবার কারণ এই।

চুপ কর। রতন চিৎকার করে স্ত্রীকে থামিয়ে দেয়। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গলা তুলে বলে– তিন তিনটা মেয়েকে আমার পার করতে হবে। এখন আমি এইসব কোষ্ঠী নিয়ে ভাবব?

এই বলে ঝপ করে সেই আতশবাজির ব্যবসায়ীর ছেলের ফটোটা জ্যোতিষীর কোলে ফেলে দেয়। জ্যোতিষী সেখানে ক্রশ চিহ্ন দেয়।

ছেলের বাবার কিছু দেনা-পাওনার কথা আছে।

যৌতুক? রতন প্রশ্ন করে। ঠিক আছে এই মেয়ের জন্য আমি কিছু টাকা জমিয়েছি। এরপরের মেয়ে দুটোর কি হবে সব দিয়ে দিলে তা জানি না। এরপর রতন আর কি করবে? কতক্ষণ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হুংকার দেয় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। রাগ কমায়।

পরের সোমবার ছেলে, ছেলের বাবা এবং আরো কয়েকজন আসে। ছোট মেয়েটা ট্রেতে করে লেবুর সরবত নিয়ে সবাইকে বিতরণ করছে। রতন আর তার স্ত্রী ওদের সঙ্গে বসে আছে ড্রইংরুমে। রুক্মিণীর মুখটা জনসন বেবি পাউডারে ধরধবে সাদা। চুলে জেসমিন ফুলের মালা। এরপর বীণার তারে ঝংকার তুলে একটা গানও করে। রুক্মিণীর চোখ দুটো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ভবিষ্যৎশ্বশুর সামনের একটা গদির উপর বসে আছে। আতশবাজির ব্যবসায়ী লোকটা মোটাসোটা। পরণে সাদা শার্ট আর সাদা সারোং বা তহবন। কানের পাশে রূপোলি চুলের গোছা। লোকটা গানের তালে তালে মাথা নাড়ছে। রতনের মনে হল এইভাবে মাথা নাড়ার অর্থ সে হয়তো মেয়েকে পছন্দ করেছে। আর ওর ভবিষ্যৎ শাশুড়ি ঘরের কড়িবর্গা থেকে আরম্ভ করে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। সে মহিলা নিজেও ধবধবে ফর্সা বিশাল আয়তনের একজন। ছেলেটাও বাবা-মায়ের ধবধবে ফর্সা রং পেয়েছে তবে সে বাবা-মায়ের মত বিশালবপু নয়, ছোটখাটো। দেখে মনে হয় সে যেন এই পরিবারের পালিত এক পোষা বেড়াল, উত্তরাধিকারী বা বংশপ্রদীপের মত সে মোটেই নয়। গানের মাঝখানে সে তার বাবার কানে কানে কি যেন বলে। ব্যবসায়ী মাথা নাড়ে। ছেলেটা উঠে দাঁড়ায় এবং ঘর ছেড়ে বাইরে যায়। বাবা তখন তার কড়ে আঙুল তুলে সকলকে দেখায়। সবাই খিল্‌খিল্ করে হাসে। ছেলেটা ফিরে এসে তার মোটাসোটা বাবা-মায়ের মাঝখানে কোনমতে ঠেসেঠুসে বসে। রতনের ছোট দুই মেয়ে ট্রে ভর্তি লেবুর রসের সরবত নিয়ে আবার ফিরে আসে। আতশবাজির ব্যবসায়ী এবং তার স্থূলাঙ্গী স্ত্রী গ্লাশ নেয়। বাবা-মাকে অনুসরণ করে ছেলেটাও। এরপর সে গ্লাশে চুমুক দিতে থাকে। যখনই সে কেবল গ্লাশে ঠোঁট ঠেকিয়েছে আবার বাবার কাঁধে হাতের টোকা দিয়ে কি যেন বলতে চায়। এই সময় আতশবাজির ব্যবসায়ী হাসে না। একটু রেগে ছেলেকে যেতে বলে। কিন্তু ছেলেটা প্রায় দৌড়ে বাইরে চলে যায়।

ছেলের এইসব বাইরে যাওয়া-টাওয়া নিয়ে কেউ যেন কিছু না ভাবে তাই আতশবাজির ব্যবসায়ী রতনকে বলে– তোমার কাছে কি কোন বিড়ি আছে? বিড়ির প্যাকেট রান্নাঘর থেকে আনতে আনতে রতন লক্ষ্য করে ওর সেই হবুজামাই অশোক গাছের গোড়ায় সজোরে পেশাব করছে। বোধহয় এমন ঘটনায় ছেলেটা নার্ভাস হয়ে ঘন ঘন পেশাব করছে– এই কথা ভেবে মনে মনে একটু হাসে রতন। ইতোমধ্যে ছেলেটার জন্য একটু স্নেহও বোধ করে সে, কিছুদিন পরই তো ছেলেটা এই বাড়ির একজন হবে। সব মানুষই বিয়ের ঘটনায় এমন নার্ভাস হয়ে যায়। ছেলেটার মনে হয় পেশাব হয়ে গেছে। সে তার পুরুষাঙ্গ ধরে একটু নাড়া দেয় তারপর ফিরে আসতে চায়। কিন্তু খানিক পরেই মনে হয় ছেলেটা কিসের ভয়ে যেন একেবারে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। তারপর মাথাটা একটু পিছে ঠেলে সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। যেমন করে একজন ডুবন্ত মানুষ নিঃশ্বাস নেয়।

পরদিন ঘটক এসে বলে যে, আতশবাজির ব্যবসায়ী মেয়েকে পছন্দ করেছে। –তাহলে তারিখ ঠিক কর। একমাস পর থেকেই বিয়ের হলগুলোর ভাড়া বেড়ে যাবে। এই বলে সে হাতের তালু চুলকায়। যদিও রতন এই কথায় মাথা নাড়ে কিন্তু মনে হয় কোন কারণে সে অন্যমনস্ক।

পরদিন বাসে চেপে রতনকারা শেঠি আমব্রেলা স্ট্রিটের উদ্দেশে যাত্রা করে। সে খাট-পালংয়ের দোকান এবং আরো নানা দোকান পার হয়ে একসময় এসে পৌঁছয় আতশবাজির দোকানের সামনে। সেই মোটা ব্যবসায়ী আতশবাজির সামনে একটা টুলে বসে আছে। কিছু কাগজের বোমা ও বারুদ সেখানে। দেখে মনে হয় ঈশ্বরের আগুন এবং যুদ্ধের সে সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। ভবিষ্যৎজামাইও তখন দোকানে। আঙুল থুতুতে ভিজিয়ে সে হিসাবের খাতাপত্র দেখছে।

মোটা ব্যবসায়ী খুব আস্তে ছেলেকে একটু পা দিয়ে গুঁতো দেয়। –এই ভদ্রলোক খুব তাড়াতাড়ি তোমার শ্বশুর হতে চলেছে তুমি কি তাকে প্রণাম করবে না? এই বলে সে রতনের দিকে তাকিয়ে হাসে, বলে– ছেলেটা খুব লাজুক।

রতন চা পান করে। মোটা ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে কিন্তু তার চোখ কেবল ছেলেটাকেই লক্ষ্য করে। একসময় সে ছেলেটাকে বলে– বাপু তুমি একটু আমার সঙ্গে বাইরে চল দেখি। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।

দুইজন পথ ধরে হাঁটতে থাকে কিন্তু অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলে না। আমব্রেলা স্ট্রিটের হনুমান টেম্পলের কাছে কতগুলো কলাগাছ জন্মেছে। সেখানে গিয়ে মুখ খোলে রতন শেঠি। বলে, রাস্তার দিকে নয় মন্দিরের দিকে মুখ করে বসতে। খানিক সময়ের জন্য সে ছেলেটাকে কথা বলতে দেয়। কিন্তু সে গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করছে ছেলেটার চোখের কোণ, নাক, কান, চুলের ধার এবং ঘাড়। একসময় সে তরুণের হাতের কবজি চেপে ধরে– কোথায় পেয়েছিলে সেই বেশ্যা যার সঙ্গে তুমি সময় কাটিয়েছ?

ছেলেটা এবার পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু রতন এমন করে কবজি চেপে ধরেছে যে ছেলেটা বুঝতে পারে কোনমতেই সে পালাতে পারবে না। ছেলেটা তখন রাস্তার দিকে তাকায়। যদি কেউ সেখান থেকে এসে সাহায্য করে বোধকরি সেই আশায়। রতন আরো জোরে হাতে চাপ দেয়। বলে– কোথায়? ঠিক করে বল? রাস্তার ধারে, হোটেলে না বনে-জঙ্গলে না কোন দালানের পেছনে?

এই বলে সে ছেলেটার কবজি এমন করে ঘোরাতে শুরু করে মনে হয় তা ভেঙে যাবে। –রাস্তার ধারে। এই বলে সে প্রায় কেঁদে ফেলে। তারপর বলে– তুমি কি করে জানলে?

এবার ছেলেটার দিকে আর তাকায় না রতন। বলে– বাজারের এক বেশ্যা। ছিঃ। এই বলে ছেলেটার গালে ঠাস করে চড় মারে। ছেলেটা কেঁদে ফেলে বলে– মাত্র একবার। এর বেশি নয়।

একবারই অনেক। যখন পেশাব কর তখন কি তোমার খুব জ্বালা যন্ত্রণা হয়?

খুব জ্বলে। ছেলেটা উত্তর করে।

বমি বমি লাগে?

ছেলেটা ঠিক নওসিয়ার মানে জানে না। যখন বুঝতে পারে প্রশ্নটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে– লাগে।

আর কি হয়?

মনে হয় একটা শক্ত মার্বেল আমার দুই পায়ের ফাঁকে কোথায় যেন আটকে আছে। কখনো ভোঁ করে মাথাটা ঘুরে যায়।

তোমার পুরুষাঙ্গ কি এখন উত্তেজিত হয়?

হয়।

এবার বল তোমার সেই যন্ত্রটা এখন দেখতে কেমন? কালো না লাল, না অন্যরকম?

এইসব কথাবার্তার আধঘণ্টা পরে দেখা যায় ওই দু'জন মানুষ তখনো কথা বলছে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে।

আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই। হাত জোড় করে বলে ছেলেটা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই। রতন শেঠি মাথা নেড়ে বলে– এখন এই বিয়ে ভেঙে দিতে হবে। আমি কি করে আমার মেয়েকে তোমার অসুখে সংক্রমিত হতে দেই? ছেলেটার মিনতি করবার ভাষার ঝোলা শেষ। নাকের ডগা থেকে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ে। এবার রেগে ছেলেটা বলে– আমি তোমাকে শেষ করে দেব। সারোংয়ে হাত মুছে রতন বলে– সেটা কি করে করবে?

বলব– তোমার মেয়ে আগে আরো লোকজনের সঙ্গে ঘুমিয়েছে। সে ভার্জিন নয়। সেই কারণে আমি বিয়ে করছি না।

সঙ্গে সঙ্গে রতনকারা শেঠি ছেলেটার চুলের গোছা ধরে পেছনের কলাগাছে জোরে ঠেঁসে ধরে। এরপর সে ছেলেটার মুখে থুতু ছিটায়। রেগে বলে– এই মন্দিরে যতগুলো দেবদেবী আছে তাদের নামে শপথ করে বলছি– এই কথা যদি বল, তোমাকে আমার এই খালি হাতে খুন করব।

সেদিন দরগায় নিজের দোকানে আগুনের মত লাল শব্দে যৌন ব্যাধির নানা কথা সে আশেপাশের তরুণদের বলে। পাপ, অসুখ। তারপর কেমন করে জীবাণু পুরুষাঙ্গ থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেই সব। চোখে, কানে তারপর বাসা নেয় নাকের ভেতর। এরপর সেইসব ছবি– ক্ষত ধরা নানাসব পুরুষাঙ্গ। কোনটা কালো, কোনটা কোঁচকানো এমনি নানা ছবি। প্রতিটি ছবিতে মুখগুলো কালো কলমে সার্কেল করা। এমন করে ছবিগুলো তোলা মনে হয় এরা সারাজীবন ধর্ষণ, অত্যাচার এইসবই করেছে। তারপর বলে– এসব থেকে মুক্তি পেতে আমার এইসব সাদা পিল ছাড়া কোন উপায় নেই।

এরপর গেল তিনমাসের মত। একদিন যখন সে তার নির্দিষ্ট জায়গায় দোকান খুলেছে, চারপাশের ক্লান্ত-করুণ-অসুস্থ যুবক তাকে ঘিরে আছে হঠাৎ একটি দৃশ্যে রতনকারা শেঠির মনে হল তার হৃদয়ঘড়িটা বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। সে আবার দেখতে পেল সেই মুখ, ঠিক তার সামনে।

কি চাও তুমি? সাপের মত হিশ্ হিশ্ করে বলে রতন। –অনেক দেরি করে ফেলেছ। আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। কি জন্য তুমি এখানে এসেছ?

সে টেবিলটা ভাঁজ করে বগলের তলে রাখে। লাল ব্যাগে ভরে ফেলে সেই ধন্বন্তরী সাদা পিল। এরপর খুব জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। একটা পায়ের শব্দ পেছনে। সেই আতশবাজির ব্যবসায়ীর ছেলে। কথা বলতে গিয়ে বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়।

আমার অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিদিন একটু বেশি করে খারাপ হয়। পেশাব করতে গেলে জ্বালা-যন্ত্রণায় আমি একশেষ। আমার জন্য তোমাকে কিছু করতেই হবে। আমাকে তোমার ওই সাদা পিলগুলো দাও। দিতেই হবে তোমাকে। রতন দাঁতে দাঁত ঘসে। –তুমি পাপ করেছ। হারামজাদা। তার ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে। বেশ্যার সঙ্গে সময় কাটিয়েছে। এবার তার ফল ভোগ কর।

এরপর রতনকারা শেঠি খুব জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। এরপর মনে হল পেছনের পায়ের শব্দ আর নেই– রাস্তায় ও একা।

পরদিন সন্ধ্যায় সেই মুখ আবার দেখতে পায় রতন। তারপর পিছে পিছে সেই পায়ের শব্দ। সে শব্দ তার সঙ্গে বাসস্টপের কাছে এসে থামে। সেই করুণ-কাতর গলা বলছে– তোমার সাদা পিলগুলো আমাকে দাও। কিনতে যা টাকা লাগে আমি তোমাকে দেব। কিন্তু রতন এমন কথায় পিছু ফেরে না।

এরপর বাসে উঠে সেইসব ব্রোসারগুলো তাসের মত ধরে তার যা বলবার বলতে থাকে। বলে– র‍্যাট রেস বা ইঁদুরের প্রতিযোগিতার কথা। দূরে সুলতান ব্যাটারির পাশের দুর্গবাড়ির রেখা চোখে পড়ে। একসময় বাসটা একটু আস্তে চলতে চলতে থামে। সে নিচে নামে। আর একজন ওর সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামে। সে চলতে থাকে। আর একজনও সমানতালে পা ফেলে পিছু পিছু আসে। এরপর রতনকারা শেঠি ছেলেটার জামার কলার ধরে বলে– ঘটনা কি তোমার? আমি তোমাকে চলে যেতে বলেছি না? আমাকে ছেড়ে চলে যাও। ভাগো।

ছেলেটা রতনের হাত সরিয়ে দেয়। তার শার্টের কলার ঠিক করে। –মনে হয় আমি মারা যাব। তোমার ওই সাদা পিলগুলো আমাকে দিতেই হবে।

শোন তাহলে মন দিয়ে আমি যা বিক্রি করি তা দিয়ে ওখানকার একজনারও অসুখ সারবে না। এটা তোমার মাথায় গেছে, না যায়নি?

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। ছেলেটা বলে– কিন্তু তুমি তো সেই বিরাট 'সেক্সোলজি কনফারেন্সে' গিয়েছিলে তাই না? প্রতিদিন অমন একটা ব্যানারই তো তুমি টাঙিয়ে রাখো। রতন আকাশে হাতদুটো তোলে। বলে– ওই ব্যানার? ওটা তো একদিন আমি একটা রেলস্টেশনে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

তারপর তুমি বারবার বল দিল্লির হাকিম ভগবান দাসের কথা। সেটা কি?

হাকিম ভগবান দাস না আমার পাছা। আমব্রেলা স্ট্রিটের একটা দোকান থেকে আমি চিনির দলা কিনি। ঠিক তোমার বাবার আতশবাজির দোকানের পাশে সেই দোকানটা। আমার মেয়েরা সেগুলো বোতলে ভরে লেবেল লাগায়, হল এবার?

এই কথাকে সত্য প্রমাণিত করতে রতনকারা শেঠি একটা বোতলের মুখ খোলে। তারপর সাদা পিলগুলো কাগজে বিছায়। মনে হয় পৃথিবীর মাটিতে নতুন বীজ ছড়ানো হল। বলে সে– পুত্র তোমাকে সেরে তুলবার মত আমার কিছুই নেই। ছেলেটা মাটি থেকে একটা সাদা পিল কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পোরে। সেই পিলের সঙ্গে কিছু ধুলোবালিও ওর পেটে চলে যায়। পাগলের মত সেই পিলকেই ওর পরিত্রাণ মনে করছে তখন ছেলেটা।

তুমি কি পাগল?

এরপর হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে ছেলেটাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে একই প্রশ্ন করে– তুমি কি পাগল?

এরপর সে দেখে সেই ছেলেটার চোখদুটো। গতবার যেমন দেখেছিল তার চেয়েও অনেক খারাপ সে দৃষ্টি। চোখগুলো জলে ভরে আছে আর রং লাল। মনে হয় পেঁয়াজের আচার। এরপর বেশ একটু ধীরে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখে।

ঠিক আছে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব। কিন্তু দাতব্যখানা খুলে বসে নেই আমি। এর জন্য তোমাকে টাকা দিতে হবে।

এর আধঘণ্টা পর দু'জন পুরুষ রেলস্টেশনের পাশে বাস থেকে নামে। এরপর এমন একটা পথ দিয়ে হাঁটে যা ক্রমাগত অন্ধকার ও সরু হয়ে গেছে। খানিকপর একটা দোকানের সামনে এসে দু'জন থামে। মনে হয় দোকানটা ওষুধের। একটা বড় লাল ক্রশ আঁকা। ভেতরে একটা রেডিওতে কন্নড় ভাষায় একটা গান বাজছে। –এখান থেকে কিছু কেন। তারপর তোমার পথ দেখ।

রতন চলে যেতে যায় কিন্তু ছেলেটা শক্ত করে ধরে আছে ওর হাত। রতন তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যেতে যায় কিন্তু ছেলেটা নাছোড়বান্দা। কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। লক্ষ্য করে দোকান থেকে বেশ কিছু সবুজ বোতল কিনেছে ছেলেটা। রতন মনে মনে ভাবে– কি দুঃখে ওকে এখানে এনেছিলাম। ছেলেটা ভুতের মত ওর সঙ্গে লেগে আছে। কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না।

সে রাতে অনেকসময় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে রতনকারা শেঠি। বউ বিরক্ত হয়। পরদিন সন্ধ্যাবেলা বাসে চেপে রতনকারা শেঠি আমব্রেলা স্ট্রিটের সেই আতশবাজির দোকানের সামনে এসে এমন জায়গায় দাঁড়ায় যেন ছেলেটা তাকে দেখতে পায়। এরপর দেখা যায় দু'জন মানুষ নিঃশব্দে পথ হাঁটছে। দু'জন এসে বসে আখের রসের সরবতের দোকানে। দোকানের ছোট আখ থেকে রস বের করবার মেসিনটা ঘুরছে। রসের সরবতের কেনা-বেচা চলছে। একসময় বলে– তুমি হাসপাতালে যাও। ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।

আমি কি করে যাই। ওরা আমাকে চেনে। বাবাকে বলে দেবে।

রতনের মনে পড়ে যায় সেই বিশালবপুর লোকটা। কানে যার চুলের গোছা। লোকটা বসে আছে আতশবাজি ও কাগজের বোমার সামনে।

পরদিন যখন সে কেনাবেচা শেষ করে টেবিলের পায়াগুলো ভাঁজ করছে দেখতে পায় একটা ছায়ামূর্তি। ওরা দরগা পার হয়। পার হয় সেইসব মানুষজন যারা দরগায় ইউসুফ আলীর নামে পয়সা দেবে বলে সেখানে জমা হয়েছে। তারপর পার হয় কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হাত-পাবিহীন কিছু মানুষ। ওরা বলছে– আল্লাহু আল্লাহু। সে চোখ তুলে দরগার সাদা ডোম লক্ষ্য করে। সে এবার সমুদ্রের দিকে যায়, ছায়ামূর্তি পেছনে। একটা পাথর পড়ে আছে সমুদ্রের কিনারে। সেখানে নিজের ডান পা রাখে রতন। তখন সমুদ্রের ভেতর জলোচ্ছ্বাস। সাদা ফেনার নাচ। মনে হয় সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে একটা ময়ূর। এবার রতন পিছু ফেরে।

আমার কি করবার আছে বলতে পার তুমি? এইসব সাদা পিল যদি না বিক্রি করি মেয়েদের বিয়ে দেব কেমন করে? ছেলেটা চুপ করে শোনে। এরপর ওরা দু'জন পাঁচ নম্বর বাস ধরে শহরে ফিরে আসে। যেন এই কথা বলতেই এতদূর আসা ওদের। তারপর এ্যাঞ্জেল টকির সামনে এসে বাস থেকে নামে। ছেলেটা সেই কাঠের টেবিল বয়ে আনছে। এরপর সে খুঁজে পায় সেই দোকান যা সে পেতে চেয়েছে। একটা বড় নোটিস আর ছবি। একটি সুখী দম্পতি বিয়ের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। বড় করে লেখা– হ্যাপি লাইফ ক্লিনিক। বিশেষজ্ঞ– ডক্টর এম ভি কামাঠ এমবিবিএস (মাইশোর), বি. মেক (এলাহাবাদ), ডিবিবিএস (মাইশোর) জি কম (বারানসি) সাফল্য নিশ্চিত।

দেখেছ নামের পরে ডিগ্রিগুলো? ও হল অত্যন্ত ভাল ডাক্তার। ওই তোমাকে বাঁচাবে।

বসার ঘরে প্রায় আধ ডজন দুর্বল, নার্ভাস, তরুণ রোগী চেয়ারে বসে। আর ঘরের কোনায় বসেছে বিবাহিত নারী-পুরুষ। ওরা দু'জন বসল বিবাহিত এবং অবিবাহিত মানুষদের মাঝখানে। রতন বেশ একটু অনুসন্ধিৎসুভাবে তাকিয়ে দেখছে, এরা কারা? ঠিক তাই। তার কাছ থেকে চিনির ডেলা কিনে দিনের পর দিন খেয়ে যাদের কোন ফল হয়নি তারাই এখানে এসে ভিড় জমিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে রোগমুক্ত হতে চেয়ে বিফল হয়েছে। আজ তারা এখানে। চিনির ডেলা বা সাদা বড়ি ওদের কিছুই করতে পারেনি। এখন হতাশা নামের দীর্ঘ রাস্তা পার হয়ে এখানে। তারা প্রথমে কোন বেশ্যার সংসর্গে পড়েছে, তারপর দরগার ক্লিনিক, এখন শেষ সম্বল নিয়ে এখানে। অপেক্ষা করছে শেষ সত্য জানবার।

একজন একজন করে সেই দুবলা পাতলা ক্ষয় হয়ে যাওয়া মানুষেরা চলেছে ডাক্তারের কাছে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় ডাক্তারের দরজা। এবার রতনকারা শেঠি বিবাহিত মানুষদের দেখে। ভাবে ওরা একা আসেনি। এসেছে যুগলে। দু'জনের দুঃখ-কষ্ট শেয়ার করবে বলে।

সেই বিবাহিত একজন উঠে দাঁড়ায়। মহিলা চুপচাপ বসে অপেক্ষা করে। কিন্তু কোন মানুষ যখন এই রোগে আক্রান্ত হয়, এই দুনিয়ায় সে তখন সত্যিই একা। তার বন্ধু-বান্ধব বউ-বাচ্চা কেউই থাকে না।

ঘরে ঢুকতেই রতনকারা শেঠির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করে– রোগীর কি হও তুমি?

ওরা চেয়ারে বসে। ঘরের দেয়ালে বিশাল এক ছবিতে পুরুষের মূত্রথলি এবং তার প্রজনন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ছবি টাঙানো। কেমনভাবে দুটো জিনিস পাশাপাশি থাকে সেটা বোঝানোর জন্য। রতনকারা শেঠি ছবির দিকে তাকিয়ে বলে– আমি ওর কাকা।

ডাক্তার ওকে শার্ট-প্যান্ট খুলতে বলে। তারপর ওর পাশে বসে। বলে– জিভ বের কর। চোখের ভেতর কেমন সেটা গভীরভাবে পরীক্ষা করে। তারপর বুকে স্টেথিসস্কোপ লাগিয়ে একবার বুকের এপাশ আরেকবার বুকের ওপাশ পরীক্ষা করে। রতন মনে মনে ভাবে– এই পৃথিবীতে বিচার বলে কি কিছুই নেই? একজন তরুণ একবারই একটা বেশ্যার সঙ্গে ঘুমিয়েছে। তারপরই এই অসুখে পড়ল?

ছেলেটার পুরুষাঙ্গ ভালমত পরীক্ষা করে ডাক্তার। এবার হাত ধোবার বেসিনে গিয়ে ভাল করে হাত ধোয়। বেসিনের উপরে উজ্জ্বল টিউব বাতি। দড়ি টানলেই জ্বলে ওঠে। এরপর ভাল করে মুখ ধুয়ে সে বাতি নেভায়। এরপর সবুজ প্লাসটিকের বাক্সেও নানা কিছু পরীক্ষা করে। সব কাজ শেষ করে এবার সে ওদের দিকে মুখ ফেরায়। তারপর একটু জোরে শ্বাস টানে।

ওর কিডনি শেষ।

শেষ?

শেষ। ডাক্তার আবার বলে।

তখন রতনকারা শেঠি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখে চেয়ারে বসে সে থর থর করে কাঁপছে।

তোমার কি সবকিছু খেতে এখন বিস্বাদ লাগে? ছেলেটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ডাক্তার।

ছেলেটা দুই হাতে চোখ ঢাকে। রতন ওর হয়ে কথা বলে– ও আসলে অসুখটা পেয়েছে একটা বেশ্যার কাছ থেকে। এতে পাপ তেমন নেই। আসলে ও জানে না এই পৃথিবীর সত্যিকারের নানা ঘটনা। কোথা থেকে কি হয়?

ডাক্তার মাথা দুলিয়ে বলতে চায়– ঠিক তাই। ডাক্তার সেই দেয়াল ছবির কিডনির জায়গায় তর্জনি রেখে বলে– শেষ। কিডনি শেষ।

সকাল ছটায় রতন আর সেই ছেলেটা বাস স্টেশনের দিকে চলেছে। ওরা যাবে মানিপালে। শুনেছে ওখানে একজন কিডনি বিশেষজ্ঞ আছেন। যিনি ওখানকার হাসপাতালে কাজ করেন। বাসস্টেশনে বসে থাকা সবুজ লঙ্গি পরা একজন বলে– মানিপালের বাস সবসময়ই লেট। কখনো পনেরো মিনিট, কখনো আধঘণ্টা, কখনো তারো বেশি। –সব কিছু ভেঙেচুরে যাচ্ছে এই শহরে। এভরিথিং ইজ ফলিং আপার্ট। যেদিন থেকে মিসেস গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সেদিন থেকেই এমন। এরপর লোকটা পা দুটো ঝোলাতে ঝোলাতে, অদৃশ্য কোন কিছুতে লাথি মেরে বলে– বাস লেট। ট্রেন ঠিকমত আসে না, চলে না। মনে হয় দেশটাকে আবার ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিতে হবে। না হলে রাশিয়ানদের হাতে, না হলে আর কাউকে। আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা মন দিয়ে শোন তোমার ভাগ্য নিয়ন্তা আমি হতে পারব না। সে যোগ্যতা আমাদের নেই।

ছেলেটাকে বসতে বলে রতনকারা শেঠি কাগজের কোণাতোলা ঠোঙায় বাদাম নিয়ে আসে। দুই রুপি এক প্যাকেটের দাম। –মনে হয় সকালের নাশতা খাওয়া হয়নি তোমার তাই না? ছেলেটা বলে– তা হয়নি। তবে ডাক্তার বলেছে কোন মশলাদার জিনিস না খেতে। খেলে অসুখের জন্য খারাপ। এরপর রতনকারা সেই বাদামওয়ালার কাছে গিয়ে মশলাবিহীন, লবণবিহীন বাদাম কেনে। দু'জনে মুচ মুচ করে সেই বাদাম চিবায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ছেলেটা দেয়ালের কাছে ছুটে যায়, খাবারগুলো উগরাতে পারলেই বাঁচে। কিছু খেলে এমনই হয় ওর। সেই সবুজ লুঙ্গির লোকটা চোখ ছোট করে তাকায়, জানতে চায় ব্যাপার। বলে– ছেলেটার খারাপ একটা কিছু হয়েছে তাই না?

বাজে কথা। খারাপ কিছু নয়। এই একটু ফ্লু জাতীয় কিছু।

এক ঘণ্টা পর মানিপালের বাস আসে।

আসার সময়ও তেমনি দেরি। প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা বেঞ্চ খালি হয়। ওরা দু'জন বসে। রতন বসে জানালার পাশে। ছেলেটাকে পাশে বসতে বলে। –যাক বাবা শেষপর্যন্ত সিট পাওয়া গেল। যা ভিড় এই বাসে। রতন একটু হাসে। তারপর খুব ধীরে ছেলেটার পিঠের উপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নেয়। ছেলেটা পকেট থেকে টাকা রাখবার ওয়ালেট বের করে। একটা একটা করে পাঁচটা এক টাকার নোট দেয় রতনকারা শেঠিকে।

কি জন্য টাকা দিচ্ছ তুমি? প্রশ্ন করে রতন।

তুমি বলেছিলে আমাকে সাহায্য করতে গেলে তোমাকে কিছু দিতে হবে। ঝপ করে টাকাগুলো ছেলেটার পকেটে ঢুকিয়ে বলে– আমার সঙ্গে এমন করে তোমার কথা বলতে হবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি ঠিকই। কিন্তু পেয়েছ কি তুমি? এটা কেবল একজনকে সাহায্য। মনে রাখবে তুমি আমার কেউ না। তোমার সঙ্গে আমার রক্তের বন্ধন নেই।

ছেলেটা কিছু বলে না।

শোন ছেলে– তোমার সঙ্গে এ ডাক্তার থেকে সে ডাক্তারের কাছে যাবার আমার সময় নেই। আমাকে টাকা রোজগার করতে হবে। দুটো মেয়েকে এখনো বিয়ে দিতে হবে। ওদের যৌতুক, বিয়ের খরচ, আরো কত কি!

ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে রতনকারা শেঠির কণ্ঠার হাড়ে মুখ ঘসতে থাকে। তারপর ভয়ংকরভাবে কেঁদে ওঠে। তার ঠোঁট রতনের বুকে, নিরুপায় হয়ে ছেলেটা ঘসছে তার মুখ। লোকেরা এমন দৃশ্যে কি ভাবে কে জানে। তারা বড় বড় চোখে ঘটনা জানতে চায়। আর এক ঘণ্টা পরে কালো দুর্গবাড়িটা চোখে পড়ে। দু'জন একসঙ্গে নামে। রতনকারা শেঠি এবং সেই ছেলে। সে অপেক্ষা করে। ছেলেটা বড় করে নাক ঝেড়ে ওর কাছে আসে। সেই কালো গম্বুজের দুর্গবাড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে রতনকারা শেঠি কবে কখন সে ভেবেছিল এই আতশবাজির ব্যবসায়ীর ছেলেকে সাহায্য করতে এত কিছু করবে ও। কেন ওর অসুখ নিয়ে এত বেশি ভাবছে ও। তখনই মনে পড়ে যায় সেই সাদা গম্বুজের ডোমের তলায় সারি সারি হাত-পাবিহীন মানুষ ক্রমাগত ভিক্ষার জন্য কাতর হয়ে চিৎকার করছে। এরপর একটা বিড়ি ধরাবে বলে সে দেশলাই বের করে পকেট থেকে। উদাস হয়ে ছেলেটাকে বলে– চল। আমার বাড়ি যেতে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে যে।

অনুবাদ সালেহা চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে ২০০৮ সালের *ম্যান বুকার* প্রাইজ জয় করেন অরভিন্দ আদিগা। বাংলা করলে যার নাম হয় অরবিন্দ। হিন্দি নাম বরখাকে আমরা যেমন বর্ষা করতে পারি না তেমন তাঁর নিজের মুখে শোনা নাম আরভিন্দকে ওই নামেই ডাকা ঠিক। জন্ম ১৯৭৪ সালের ২৩ অক্টোবর। বাবা ডাক্তার মাধব আদিগা ও মা উষা আদিগা। স্কুলের পড়াশুনা মাদ্রাজে। এরপর পড়াশুনা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কলম্বিয়া এবং পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্রিটেনের *টাইমস*, *ফিনানসিয়াল টাইমস*, *ইনডিপেনটেন্ড*, *গার্ডিয়ান* কাগজে নিয়মিত লেখেন অরভিন্দ। ২০০৮ সালে *দি হোয়াইট টাইগার* 'ম্যান বুকার' জয় করবার আগে থেকেই ব্রিটেনের বড় বড় পত্র-পত্রিকা তাঁর কথা জেনেছে। ব্রিটেনের বিখ্যাত কাগজ *ডেলিটাইমস* তাঁর লেখা নিয়মিত ছাপাত। তিনি *ফিনানসিয়াল টাইমস*-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে স্টকমার্কেট নিয়ে লিখলেও মাঝে মাঝে বিখ্যাতদের ইন্টারভিউ নিতেন। *দি হোয়াইট টাইগার* বলরাম নামের এক সামান্য ড্রাইভারের গল্প। বলরাম যার নাম এবং তারই জবানীতে সৃষ্ট এক অসাধারণ উপন্যাস। তাঁর গল্প বলার কৌশল, উইট, হিউমার, স্যাটায়ার পাঠককে টেনে নিয়ে যায় শেষপর্যন্ত। একবার শুরু করলে থামা শক্ত। যে মানুষটি মুরগির খাঁচায় বাস করতে করতে একদিন খাঁচা খুলে বেরিয়ে পড়তে শেখে। তিনি বলেন– দরজাটাতো সবসময় ছিল কিন্তু কেবল মনের বল ছিল না দরজাটা খুলে ফেলার। যেভাবেই হোক একজন বলরাম একদিন একটা বন্ধ দরজা খুলতে পেরেছিল। গল্পের ঘটনার চাইতে আমাকে বেশি টেনেছে তাঁর গল্প বলার চাতুর্য বা স্টাইল। ইংরেজি ভাষায় এমন দখল ইংরেজি জানা বড় বড় পণ্ডিতদেরও বিস্মিত করে। তীক্ষ্ণ স্যাটায়ারের চাকু আমাদের বিদ্ধ করে, বিব্রত করে। খাঁচার দরজা থাকে। কেউ যদি দরজাটা খুলতে শেখে সেটাই হয় ঘটনা। আসলে এটা একটি প্রতীকী ঘটনা। বুকার পাওয়ার পর ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেছিলেন– এদের নিয়ে তিনি লিখছেন তার কারণ একদিন গুজতাভ ফ্লবার্ট, বালজাক, ডিকেন্সের কলম কেমন করে একটা সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে বদলাতে সমর্থ হয়েছিল, তেমনি তাঁর উদ্দেশ্য। লেখকের কলম অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ওই ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেছিলেন, 'A time when India is going through great changes with China, is likely to inherit the world from the west, its important that writers like me try to highlight the brutal injustice of society(Indian) . That's what I am trying to do – it is not an attack on the country, its about greater process of self-examination।' লক্ষ্য তাঁর একই। সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বুকার-এ চতুর্থ ভারতীয় তিনি। সালমান রুশদি, অরুন্ধতি রায়, কিরণ দেশাইয়ের পর তিনি। যদিও এঁদের মাঝখানে ছিলেন ভি এস নাইপল কিন্তু জন্মসূত্রে তিনি ভারতীয় নন। পুরুষানুক্রমে তাঁরা ত্রিনিদাদের বাসিন্দা।

বর্তমান গল্পটি 'হোয়াইট টাইগারের' পরের উপন্যাস 'বিটুইন আসাসিনেশন' থেকে নেওয়া। এখানেও এসেছে ভারতের সেই সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের জীবনের নানা কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মত নানা চরিত্র। এই গ্রন্থটিকে উপন্যাসও বলা যায় আবার তেরো বা চোদ্দটি ছোটগল্পের সংকলনও বলা যায়। এটি কিট্টুর নামে একটি কাল্পনিক শহরের গল্প। বইয়ের প্রথমে সে শহরের একটি মানচিত্র এঁকেছেন তিনি। সব গল্পে ছোটগল্পের কাঠামো নেই, এমন সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা আছে বলে আমার ধারণা। ওরা থাকে ওধারে, সেই ওদের কথাই এখানে বলা হয়েছে। ●

সফদর জং টম্ব

ভ্রমণ

দিল্লি দর্শন

জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া

ভারতের নয়া দিল্লিতে সার্কের 'হাইওয়ে এন্ড ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর ওপর একমাসের ট্রেনিংয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণের আমন্ত্রণে ১৯৮৭ সালে আমার প্রথম ভারত তথা বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিলেন সওজ-এর ডিজাইন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম। বিদেশ গমনের সরকারি আদেশ, পাসপোর্ট ও ভারতীয় ভিসা ও এয়ার টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পন্ন করে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ দুপুরে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে রওনা দিই। ভারত সফরে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও সঙ্গী হন। তবে তাঁদের আপাত গন্তব্য কলকাতা। স্থানীয় সময় বিকাল চারটায় আমরা কলকাতা পৌঁছি। আমার স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা কলকাতায় থেকে যান। আমি ও আশরাফ দু'ঘণ্টা বিরতির পর আবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হই। রাত সোয়া আটটায় দিল্লি বিমানবন্দরে আমাদের বিমান ভূমিস্পর্শ করে।

ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সেরে বের হয়ে দেখি, National Institute for Training of Highway Engineers (NITHE)-র ডিরেক্টর মি. এম কে সাক্সেনা আমাদের রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন। তিনি এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের গাড়িতে করে দিল্লির জোড়বাগ এলাকায় একটি রেস্ট হাউসে তোলেন।

লাল কেল্লা

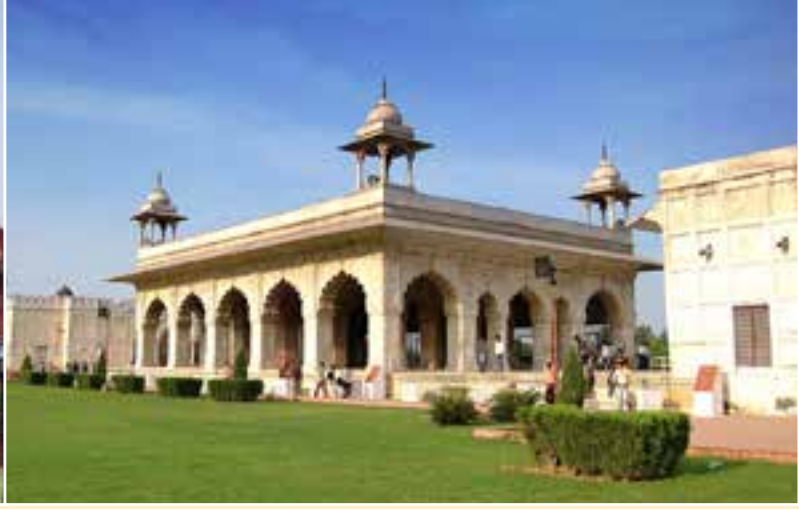

দেওয়ানি আম, লাল কেল্লা

কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান ও নেপাল থেকে দু'জন করে চারজন ও শ্রীলঙ্কার একজন আমাদের আগেই এসে গেছেন। রেস্ট হাউসে খাবার ব্যবস্থা নেই। নিকটবর্তী 'মিনি মোগল' নামে এক খাবার হোটেলে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হল। পরদিন কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য দু'জন ভারতীয়ও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

দিল্লিতে প্রথম দিন

১৫ ডিসেম্বর সকালে আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। প্রথমে সকালে চলে রেজিস্ট্রেশন ও পরিচয় পর্ব। NITHE-র পরিচালক ও কর্মকর্তা এছাড়াও একে একে পরিচিত হই শ্রীলঙ্কার ড. অশোক ডি সিলভা, নেপালের কিরণলাল যোশি ও সন্তোষকুমার ভট্টরায়, পাকিস্তানের ইউসুফ আলি ও খায়ের মোহাম্মদ সোলাঙ্গি এবং স্বাগতিক দেশের অর্থাৎ ভারতের বলদেব রাজ সুরি ও অরবিন্দ সাহার সঙ্গে। NITHE-র পরিচালক মি. সাক্সেনা আমাদের নিয়ে গেলেন জোড়বাগের কাছে International Centre-এ। সেখানে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ভারতের কেন্দ্রীয় সার্ফেস ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মি. এব্রাহাম। NITHE-র অধ্যক্ষ এন শিবগুরু সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর লাঞ্চ। লাঞ্চের পর অরিয়েন্টশন ও ব্রিফিং। চারটার পর ছুটি, তারপর যার যেখানে খুশি ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ানো। দিল্লি আমার কাছে নুতন নয়, কিন্তু সহকর্মী আশরাফের জন্য নতুন। আশরাফকে নিয়ে দিল্লি শহর ঘুরে বেড়ানোর জন্য বের হলাম।

ভারতের অতীত ও বর্তমানের প্রতীক দিল্লি। সুদূর অতীতে খ্রিস্টজন্মের এক হাজার বছরেরও আগে মহাভারতের পাণ্ডবেরা এখানে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁরা এর নাম রাখেন ইন্দ্রপ্রস্থ। সেই ইন্দ্রপ্রস্থ হয়েছে দিল্লি, এখন নয়া দিল্লি। শুধু নামের বদল হয়নি, বারবার বদল হয়েছে এর মালিকানার। এই যুগে এসে দিল্লিকে রাজধানী করে প্রথম রাজ্যপাট গড়ে তোলেন অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজপুতেরা। একাদশ শতকে আফগান হানাদার মোহাম্মদ ঘোরির দখলে যায়। তারপর আসে তুর্কিরা। চতুর্দশ শতকের প্রথমে তুর্কি সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক এখানে নুতন শহর তুঘলকাবাদ গড়ে তোলেন। পঞ্চদশ শতকে লোধিবংশ রাজ্যপাট গড়ে তোলে। এই লোধিবংশের সম্রাট ইব্রাহিম লোধিকে ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে হারিয়ে চেঙ্গিস ও তৈমুরের উত্তরসূরী বাবর দিল্লিতে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ১৮০৩ সালে দিল্লি আবার ব্রিটিশের পদানত হয়। ১৯১১ সালের মধ্যে ব্রিটিশের হাতে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠে নতুন দিল্লি। পুরনো দিল্লি ও নতুন দিল্লিতে দর্শনার্থীদের দেখার জন্য আছে বিভিন্ন শাসনামলে তৈরি অজস্র সৌধ, মিনার, স্তম্ভ, দুর্গ, উপসনালয় এবং বহু দৃষ্টিশোভন বাগান-উদ্যান। তার সঙ্গে রয়েছে আধুনিককালে গড়ে তোলা দৃষ্টিনন্দন বিশালাকৃতির প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ভবন এবং মন-ভোলানো চোখ-ধাঁধানো বিপনিবিতানসমূহ।

আমাদের ট্রেনিং কোর্সের ফাঁকে ফাঁকে দিল্লি ও দিল্লির বাইরে বিভিন্ন দ্রষ্টব্য দেখার কর্মসূচি রাখা হয়েছে, যাতে ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলি দেখানো হবে। কাজেই সেগুলি বাদ দিয়ে আমি আশরাফকে নিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলের বাণিজ্যিক এলাকা কনট প্লেসে এলাম। কনট প্লেস বা কনট সার্কাসকে বলা যায় হার্ট অফ দিল্লি, আমাদের যেমন গুলিস্তান। বিরাট গোল চত্বর, বৃত্তাকার পরিধিতে সুপ্রশস্ত রিং রোড। রিং রোড থেকে নগরের বিভিন্ন দিকে যাবার সাতটি রাস্তা বের হয়েছে। কনট প্লেস এলাকায় আছে বড় বড় বাণিজ্যিক অফিস, ব্যাংক, হোটেল, বিমান সংস্থার অফিস এবং ঝক্‌ঝকে দোকানপাট। ব্রিটিশ আমলে তৈরি অধিকাংশ বাড়িঘরের স্থাপত্য ও বিন্যাস খুবই আকর্ষণীয়। আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। একসময় দেখি, গোল চত্বর বা উদ্যানের এক পাশ দিয়ে অনেক লোক নীচে নেমে যাচ্ছে, আবার অনেকে নীচ থেকে উপরে উঠে আসছে। কৌতূহলী হয়ে আমরা ওদিকে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। দেখলাম, ভূগর্ভে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিরাট বাজার, যার নাম 'পালিকা বাজার'। পালিকা বাজারের অধিকাংশ ক্রেতা বালিকা অর্থাৎ মহিলা। আমরা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ফিরে পালিকা বাজার দেখলাম, বালিকাদের কেনাকাটা দেখলাম। আমাদের কোন কেনাকাটা ছিল না। তাই একসময় পালিকা বাজার থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে 'যন্তর মন্তর'-এ এসে পৌঁছলাম। এটি একটি মানমন্দির। জয়পুরের মহারাজা জ্যোতির্বিজ্ঞানী সওয়াই জয় সিং ১৭২৪ সালে এই অপূর্ব মানমন্দিরটি নির্মাণ করেন। অবশ্য এর আগে তিনি জয়পুরেও অনুরূপ বা আরো সুন্দর একটি মানমন্দির বা 'যন্তর মন্তর' স্থাপন করেছিলেন। আমরা পরে জয়পুরে সেটিও দেখেছিলাম। যন্তর মন্তর হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের পরিভ্রমণ বা গতিবিধি পর্যবেক্ষণ যন্ত্র। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে এটির আবেদন কমে এলেও এখনো নাকি নিখুঁতভাবে স্থানীয় সময়, সূর্যের অবস্থান, দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ, ধ্রুবতারা, তারকা, উপগ্রহের গতিপথ এবং গ্রহণের নিখুঁত হিসাব ধরা পড়ে যন্তর মন্তরের ১৮টি পাথরের জ্যামিতিক যন্ত্রে। সময় মাপার জন্য আছে বিশালাকার প্রিন্স ডায়াল– 'সূর্যঘড়ি'। সূর্যঘড়ির দেখানো সময়ের সঙ্গে ২৯ মিনিট যোগ করলে ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম পাওয়া যায়। সত্যি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি!

যন্তর মন্তর দেখে আমরা জোড়বাগে আমাদের আস্তানায় ফিরে এলাম। রাত ৮টায় রাতের খাবারের জন্য আমরা জড়ো হলাম আমাদের নির্দিষ্ট 'মিনি মোগল' রেস্টুরেন্টে। মিনি মোগলের খাবার মোগলদের খাবারের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও খুবই ভাল লাগল, বিশেষ করে এদের নানরুটির যেন তুলনা নেই। এরপর আমি যে কয়দিন এখানে ছিলাম লাঞ্চ ও ডিনারে কখনো ভাত খাইনি। আমাদের আশরাফের আবার ভাত না হলে চলে না। 'ভাত না খেয়ে থাকি কেমন করে' এই তার বিস্ময়। উত্তরে বলতে হল, 'বাংলাদেশে ফিরে গেলে তো প্রতিদিনই ভাত খেতে হবে, সেখানে তো এই নানরুটি পাওয়া যাবে না, তাই যে ক'দিন আছি নানই খাই!' এদিকে পাকিস্তানের ইউসুফ ও সোলাঙ্গি আমার ঠিক উল্টো। তাদের বক্তব্য, 'পাকিস্তানে তো এরকম ভাত-তরকারি পাওয়া যায় না, তাই যে কয়দিন এখানে আছি শুধু ভাতই খাব।' শ্রীলঙ্কার অশোক আর নেপালের কিরণ ও সন্তোষের মিনি মোগলের খাবার তেমন ভাল লাগছে না। তাঁরা বেশিরভাগ সময়ে অন্য জায়গায় গিয়ে খেয়ে আসতেন। মিনি মোগলের বাইরে একটা পানের দোকান, সেখানে বিক্রি হচ্ছে সাদা মাদ্রাজী পান।

জুম্মা মসজিদ, দিল্লি

ইন্ডিয়া গেট

মাদ্রাজী পানের আলাদা স্বাদ। মাদ্রাজী পানের বিশেষ স্বাদের কথা বলায় আশরাফ, ইউসুফ ও সোলাঙ্গি আমার সঙ্গে পান খাওয়ায় যোগ দিলেন। নানা মশলা দিয়ে তৈরি পানের খিলি চিবোতে গেলে চারিদিকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে কালেভদ্রে হয়তো পান খেয়েছি, কিন্তু এখানে এমন রসালো পানের স্বাদ পেয়ে আমি প্রতিদিনই মুখ রাঙিয়েছি। আমার দেখাদেখি অন্যরাও নিয়মিত খেয়েছেন। আমরা রীতিমত পানাসক্ত!

লোধি গার্ডেন / সফদর জং টম্ব

১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর আমাদের ট্রেনিং সেশন চলে সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। দুপুরে একঘণ্টার মধ্যাহ্নবিরতি। শীতকাল বলে পাঁচটার পরই সন্ধ্যা নেমে আসে। তাই আর তেমন কোথাও দূরে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হয় না। কাছের লোধি গার্ডেন বা আশেপাশের এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে অমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে লাগলাম।

পঞ্জদশ ও ষোড়শ শতকে লোধি শাসকেরা এই বাগিচা গড়ে তোলেন। এখানে আছে লোধি সম্রাটদের কবরস্থান। এই বাগিচা দিল্লির অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন। বড় বড় গাছপালা শোভিত বিশাল এলাকা জুড়ে লোধি গার্ডেন, চারিদিকে সবুজের সমারোহ। ছায়াঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে মনটা শ্যামলিমায় ভরে উঠে। জোগবাগে অবস্থানকালে প্রায়ই বিকেলে লোধি গার্ডেনে ঘুরে বেড়াতাম, বড় বড় বৃক্ষের সুশীতল ছায়ার নীচে বসে বিশ্রাম নিতাম। বাগিচার ভিতর লোধি স্থাপত্যে নির্মিত দর্শনীয় সেকান্দর শাহ লোধির সমাধি ও বাগিচার উত্তরে বড়া গম্বুজ মসজিদটি ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন বিকালে জোড়বাগ থেকে অরবিন্দ মার্গ ধরে উত্তরদিকে হাঁটতে হাঁটতে অরবিন্দ মার্গ ও লোধি রোডের কোণায় চলে গেলাম। এখানে মোগল স্থাপত্যে নির্মিত আরেকটি অপূর্ব সুন্দর কীর্তি আছে– সফদর জং টম্ব, যদিও এটি মোগলদের তৈরি নয়। এই দৃষ্টিনন্দন স্মৃতিসৌধটি অযোধ্যার নবাব মির্জা আবুল মনসুর খানের, যিনি সফদর জং নামেও পরিচিত ছিলেন। হুমায়ুন টম্বের অনুকরণে ১৭৫৩-৭৪ সালে এটি তৈরি করেন তাঁর পুত্র নবাব সুজা-উদ-দৌলা। বিরাট বাগিচার মধ্যে ৪০ ফুট উঁচু ঝকঝকে স্মৃতিসৌধ, চারপাশে চারটি সুউচ্চ মিনার।

লাল কেল্লা / দেওয়ানি আম / দেওয়ানি খাস

২০ ডিসেম্বর আমাদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে স্থানীয় দ্রষ্টব্য দর্শনের আয়োজন করা হয়। সকাল সাতটায় মি. সাক্সেনা একটা মিনিবাস নিয়ে আমাদের রেস্ট হাউসে এসে হাজির। আমরা তৈরি ছিলাম, তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়লাম। স্বাভাবিকভাবে দিল্লি পর্যটনে প্রথমেই আসে মোগল স্থাপনা দর্শনের প্রস্তাব। সাক্সেনাসাহেব আমাদের নিয়ে এলেন দিল্লিতে মোগলদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'লাল কেল্লা'র সামনে।

চতুর্থ মোগল সম্রাট শাহজাহান আগ্রা থেকে রাজধানী সরিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসেন। তার আগে তৈরি করান যমুনার পাড়ে মোগল স্থাপত্যে লাল বেলেপাথরের বিশাল কেল্লা। ১৬৩৮ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু করে ১৬৪৮-এ শেষ হয়। মূল স্থপতির নাম মকরমাৎ খান। দুর্গের স্থাপত্য ও নির্মাণশৈলী অনবদ্য। অষ্টকোণী আড়াই কিলোমিটার ব্যাপ্ত দুর্গের তিনদিকে ছিল ৩৩ ফুট গভীর পরিখা। প্রাচীরের উচ্চতা যমুনার দিকে ৫০ ফুট, শহরের দিকে ৯০ ফুট। দুর্গে প্রবেশের ছোট-বড় অনেক গেইট ছিল, তবে প্রধান প্রবেশপথ ছিল তিনটি– দক্ষিণে 'দিল্লি গেইট', পশ্চিমে 'লাহোর গেইট' ও দক্ষিণ-পশ্চিমে 'কাশ্মীরি গেইট'।

কেল্লার প্রধান প্রবেশপথের অনতিদূরে আমরা বাস থেকে নামলাম। কেল্লায় প্রবেশের জন্য এখন শুধু একটি গেইট ব্যবহৃত হয়, খুব সম্ভবত দিল্লি গেইট। আমাদের গাইড মি. সাক্সেনা ভিতরে ঢোকার টিকেট সংগ্রহ করলেন। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

প্রধান তোরণ অতিক্রম করার পর একটি খোলা চত্বর। তারপর বড় বড় স্তম্ভ শোভিত দেওয়ানি আম। এটি ছিল সম্রাটের প্রজাসাধারণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের দরবার হল। হলের পিছনদিকে সম্রাটের সিংহাসন। সেকালে এটি মণিমুক্তা খচিত ছিল, সামনে ছিল সোনার রেলিং। প্রশাসন দপ্তরও ছিল দেওয়ানি আমে। আমাদের গাইড জানালেন, সম্রাট প্রতিদিন এখানে দুই ঘণ্টা বসতেন। দেওয়ানি আমের পিছনে ফোয়ারায় শোভিত বাগিচা ও কয়েকটি মহলের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল, তার মাঝ দিয়ে নাকি প্রবাহিত ছিল বেহেস্তের নহর। উদ্যানের পিছনে অনুপম ভাস্কর্য ও কারুকার্যময় শ্বেতমর্মরে গড়া দেওয়ানি খাস। এটি বিশেষ অতিথিদের সঙ্গে সম্রাটের মিলন কক্ষ। নানা রঙের রত্নে খচিত স্তম্ভে সজ্জিত দেওয়ানি খাসের জালির কাজ অপরূপ। এই দেওয়ানি খাসেই ছিল সম্রাট শাহজাহানের বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন। অতি মূল্যবান নানা মণিমুক্তা বসানো সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরি ময়ূর সিংহাসনের সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। সেকালেই দাম ছিল ১ কোটি ২০ লাখ পাউন্ড। ভারতের এই মহামূল্যবান সম্পদটি ১৭৩৯ সালে লুণ্ঠন করে নিয়ে যান নাদির শাহ।

রঙমহল / মোতি মসজিদ

দেওয়ানি খাস পেরুতেই শুরু হয় বেগমদের খাস মহল– রঙমহল। রঙমহলের সৌন্দর্যও অতুলনীয়। রঙমহলের ভিতরে ছিল ফোয়ারা। সিলিংয়ে ছিল সোনা ও রূপার আস্তরণ। তার প্রতিবিম্ব পড়ত মেঝের জলাধারে। রঙমহলের সর্বদক্ষিণে কাচে মোড়া মমতাজের শিশমহল। রাজস্থানী শৈলীতে রঙিন কাচে আঁকা ছবি ও অতি মূল্যবান রত্নসম্ভারে কারুকার্যময় শিশমহল অনবদ্য। রঙমহলের উত্তরে শাহজাহানের নিজস্ব মহল– খাসমহল। খাসমহলের স্নানঘরটি দর্শনীয়। যমুনার দিকে খাস মহলের কারুকার্যময় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সম্রাট নদীর শোভা উপভোগ করতেন। একদিন কি জাঁকজমকে কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল এসব প্রাসাদ ও মহল, আজ শুধু কালের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন সম্রাটের প্রমোদকক্ষে জ্বলে না রত্নদীপাবলি, শোনা যায় না রাজনর্তকীর নূপুর-নিক্কন। 'বন্দীরা গাহে না গান, যমুনা-কল্লোল সাথে নহবত মিলায় না তান'।

দেওয়ানি খাসের উত্তর-পশ্চিমে আছে একটি ছোট অথচ অপূর্ব সুন্দর মসজিদ- মোতি মসজিদ। শাহজাহানের পুত্র ঔরঙ্গজেব শ্বেতমর্মরের এই মনোমুগ্ধকর মসজিদটি তৈরি করেন, তাঁর নিজের পরিবারের মহিলাদের নামাজ পাঠের জন্য। ছোট্ট অথচ অপূর্ব সুন্দর এই মসজিদটি দেখে আমার মনে হল, এটিই লাল কেল্লার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্যকীর্তি।

লোটাস টেম্পল

হুমায়ুন টম্ব

জুম্মা মসজিদ

আমরা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ফিরে মোগলদের এই বিশাল কর্মকাণ্ড, ভোগবিলাস ও জাঁকজমকের বিপুল আয়োজন দেখলাম। তারপর কেল্লা থেকে বের হয়ে এলাম। এরপর সাক্সেনাসাহেব আমাদের নিয়ে গেলেন মোগলদেরই আরেক কীর্তি দেখানোর জন্য– ১৬৫০ থেকে ১৮৫৬ সালে নির্মিত সম্রাট শাহজাহানের শেষ কীর্তি জুম্মা মসজিদ। লাল বেলেপাথর ও সাদা মার্বেলের সমন্বয়ে তৈরি। এটি এখন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মর্মকেন্দ্র। অনুচ্চ টিলার উপর বিশাল মসজিদ। আমরা ১২২ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে মসজিদ চত্বরে উঠলাম। মসজিদের সামনে সুপ্রশস্ত চত্বর। মসজিদের দু'পাশে দু'টি সুউচ্চ মিনার, মিনারের উচ্চতা ১৩২ ফুট। মসজিদের তিনটি গম্বুজের মাঝেরটির উচ্চতা ১৩৫ ফুট। প্রধান হলের আয়তন ২০১ x ১২০ ফুট। আশরাফ এবং পাকিস্তানের দুই বন্ধু ইউসুফ ও সোলাঙ্গী মসজিদের ভিতরে ঢুকে নামাজও আদায় করলেন। আর আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে এই অপরূপ উপাসনালয়টির সৌন্দর্য অবলোকন করতে লাগলাম।

চাঁদনী-চক

জুম্মা মসজিদ থেকে নেমে এসে আমরা হেঁটে চাঁদনী-চক'-এ এলাম। পুরনো দিল্লিতে জুম্মা মসজিদের কাছে শাহজাহান দুহিতা জাহানারা বেগমের হাতে গড়া ইতিহাস-খ্যাত চাঁদনী চক এখন একটি ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা। এককালে চাঁদনী চকের বাজারে ঘুঙুর পায়ে ঘুরে বেড়াতেন সুন্দরী রাজ-নন্দিনীরা। তাঁদের আশেপাশে দেখা যেত চোখে সুরমা, কানে আতর দেওয়া রাজপুরুষদের।

চাঁদনী চকের আছে সুগভীর ইতিহাস। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের তাঁর *ট্রাভেলস্ থ্রু দ্য মোঘল এম্পায়ার* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে এই বাজারে হীরা-জহরত বেচা-কেনা করতেন। তিনি আরো লিখেছেন, রাজপরিবারের সদস্যরা এবং অভিজাত ব্যক্তিরা সাজানো ঘোড়ার ও গরুর গাড়িতে এখানে জমায়েত হতেন। ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা হাতির পিঠে চড়েও আসতেন। তাঁদের আপ্যায়নের জন্য রাস্তার দুধারে গড়ে উঠেছিল সুন্দর সুন্দর কফি হাউস ও সরাইখানা।

চাঁদনী চকের কালো অধ্যায় হল, এখানকার কোতোয়ালীতে ঔরঙ্গজেব নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুরকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। চাঁদনী চক আরো এক নৃশংস রক্তকাণ্ডের সাক্ষী। পিতা শাহজাহানকে কারাগারে বন্দী করে এখানে জনসমক্ষে তার তিন ভ্রাতা দারা, মুরাদ ও সুজাকে হত্যা করেছিলেন জঙ্গী ঔরঙ্গজেব। সম্রাট শাহজাহানের প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র এবং দিল্লির সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী দারাহশিকোকে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় চাঁদনী চকে এনে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। দারাহ ছিলেন দিল্লির মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শহরের মানুষ হতাশায় ভেঙে পড়েন।

চাঁদনী চক এখন মসলা, গয়না এবং ঘরোয়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বিশাল বাজার। সন্ধ্যায় আলো ঝলমলে চাঁদনী চকে ক্রেতা-বিক্রেতা লোকজনের প্রচুর ভিড় হয়। হকারদের হাঁকডাক, মানুষের কলরব সব মিলে রমরমা অবস্থা। এখন ভরদুপুর, তাই তেমন ভিড় নেই। লাঞ্চের সময় পার যাচ্ছে দেখে আমরা আর বেশি ঘোরাঘুরি না করে বাসে উঠে পড়লাম। সাক্সেনাসাহেব আমাদের জোড়বাগে মিনি মোগলের কাছে নামিয়ে দিলেন।

ইন্ডিয়া গেট

২১ ডিসেম্বর ছিল আমাদের ডে-অফ। সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে আমরা আলোচনা করছিলাম, আজ কোথায় বেড়ানো যায়– কিভাবে যাওয়া যায়। নেপালি দু'জন বললেন, তাঁদের অন্য প্রোগ্রাম, আমাদের সঙ্গে যাবেন না। আর ভারতীয়েরা তো আমাদের সঙ্গে আগে থেকেই নেই। বাকি থাকলাম আমরা পাঁচজন– পাকিস্তানের দু'জন, শ্রীলঙ্কার একজন, আর আমরা দুই বাংলাদেশী। আমরা ঠিক করলাম প্রথমে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্থাপনাগুলি দেখব। খাওয়-দাওয়া সেরে রেস্ট হাউসের কেয়ার টেকারের সাহায্যে সারাদিনের জন্য একটি মারুতি ভ্যান ভাড়া করলাম।

আমরা প্রথমে এলাম রাজপথের মাথায় ইন্ডিয়া গেট-এ। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশদের হাতে তৈরি ১৪০ ফুট উঁচু 'ইন্ডিয়া গেট' বা 'ভারত তোরণ'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত 'ওয়ার মেমোরিয়াল আর্চ'। দেখলাম আর্চের দেয়াল গায়ে অগণিত সৈনিকদের নাম খচিত।

রাষ্ট্রপতি ভবন / সংসদ ভবন / লোটাস টেম্পল

ইন্ডিয়া গেট থেকে সোজা প্রশস্ত সড়ক রাজপথ পশ্চিমে তিন কিলোমিটার গিয়ে শেষ হয়েছে সুরম্য রাজসিক প্রাসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন-এ। ৩৩০ একর জমির উপর নানা বর্ণের পাথরে তৈরি সুউচ্চ গম্বুজ নিয়ে বিশাল সৌধ। ১৯২১-২৯ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয়-এর আবাসভূমি হিসেবে নির্মিত। ভিতরে প্রবেশের জন্য ট্যুরিস্ট অফিস থেকে অনুমতি নিতে হয়। আমরা অনুমতি নিয়ে আসিনি, কাজেই ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। বাইরে থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। ভিতরে মোগল উদ্যানটিও নাকি খুব সুন্দর। দুর্ভাগ্য, আমাদের দেখার সুযোগ হল না।

রাষ্ট্রপতি ভবনের উত্তর-পূর্বের রাজপথের উত্তরে সংসদ মার্গে ভারতের পার্লামেন্ট ভবন বা সংসদ ভবন অবস্থিত। ব্রিটিশ স্থাপত্যে ও ঐতিহ্যে গড়া চক্রাকার অতীব চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন এই সংসদ ভবন। আমরা চারিদিকে ঘুরে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

কনট প্লেস বা সার্কাস থেকে বাসে করে ১২ কিমি দূরে দিল্লির আরেক দর্শনীয় স্থাপনা বাহাই মন্দির 'লোটাস টেম্পল'– দিল্লির পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ। বিশাল বাগিচার মাঝে বিশাল জলাশয়। তার মাঝে অর্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে বিরাট ১০০ ফুট উঁচু মন্দির। ২৩০ ফুট ব্যাসের হলে একসঙ্গে ১৩০০ ভক্তের বসার বা ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। তবে মন্দিরের ভিতরে মৌনতা পালন করতে হয়। এলাকার শান্ত-স্নিগ্ধ ও নান্দনিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হলাম। মন্দিরে ঢোকার পর মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ মৌনভাবে বসে রইলাম। তারপর প্রশান্ত মন নিয়ে বের হলাম, বহুক্ষণ ধরে এই রেশ অব্যাহত থাকল।

রাজঘাট / শান্তিবন / শক্তিস্থল / বিজয়ঘাট

৩ জানুয়ারি সকালে আশরাফকে নিয়ে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় গেলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আশরাফকে নিয়ে আমি সপরিবারে) দিল্লি দেখতে বের হলাম। প্রথমে আমরা চিত্তরঞ্জন পার্ক থেকে বাসে করে কনট প্লেসে এলাম। কনট প্লেসের এদিক সেদিকে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আমরা রাজঘাটের দিকে যাবার জন্য একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে তাতে উঠে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা রাজঘাটে এসে পৌঁছলাম।

কনট সার্কাস থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে ফিরোজ-শা কোটলার উত্তরে যমুনার কিনারে ভারতের জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সমাধি রাজঘাট। কালো পাথরে বর্গাকৃতি সমাধিবেদি। উপরে খোদিত– 'হে রাম'। নাথুরাম গড্‌সের গুলিতে প্রাণত্যাগের মুহূর্তে মহাত্মার শেষ উচ্চারণ ছিল এই শব্দবন্ধ।

রাজঘাটের উত্তরে লাগোয়া শান্তিবন। বিশাল বর্ণাঢ্য গোলাপ বাগানের মাঝে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সমাধিবেদি। গোলাপ বাগানে একেক খণ্ড জমিতে একেক জাতের গোলাপ। এভাবে পুরো এলাকা জুড়ে নানা প্রজাতির নানা বর্ণেরও নানা আকৃতির অজস্র গোলাপ ফুটে আছে। এখানেই জীবনে প্রথম কালো গোলাপ দেখতে পেলাম। গোলাপ-প্রিয় নেহরুর সমাধিস্থল গোলাপে ঘেরা। একসঙ্গে এত রকমের গোলাপের বিরাট সমাহার দেখে অভিভূত হই।

রাজঘাট ও শান্তিবনের মাঝে রয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর সমাধিস্থল– শক্তিস্থল। একটি ধূসর লাল মনোলিথিক পাথরের স্মৃতিসৌধ।

শান্তিবনের উত্তরে বিজয়ঘাট। এটি ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সমাধিস্থল। অত্যন্ত সহজ সরল সাদাসিদে জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সৎ, নিরহংকার ও শান্তিকামী মানুষ হিসেবে ভারতের এই দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনাম ছিল বিশ্বজুড়ে। কারণ তৃতীয় বিশ্বে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধজয়ের পর রাশিয়ার তাশখন্দে শান্তি-সম্মেলনে যোগদানকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মরদেহ ভারতে ফিরিয়ে এনে বিজয়ঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। যমুনার পারে শান্ত স্নিগ্ধ নিরিবিলি পরিবেশে শান্তিকামী মহান নেতার উপযুক্ত সমাধিক্ষেত্র। আমরা বেশ কিছুক্ষণ এখানে বসে কাটালাম।

ইতিহাসখ্যাত পানিপথ

৪ জানুয়ারিতে আমাদের আবার ফিল্ড ভিজিট ছিল। দিল্লি মহানগরীর অবস্থান ভারতের উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানা রাজ্যের মাঝখানে, এর পূর্ব-দক্ষিণে উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিমে হরিয়ানা। হিন্দু ও শিখদের মধ্যে পাঞ্জাব ভাগ করে দেওয়া হলে হিন্দু-ভাগটির নাম হয় হরিয়ানা। আমরা দিল্লি থেকে বের হয়ে সোজা উত্তরে এক নম্বর জাতীয় মহাসড়ক ধরে হরিয়ানার উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম, এই মহাসড়কের পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ পরিদর্শনের জন্য। এই মহাসড়কটি সেই পুরনো বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড', যা শের শাহ নির্মাণ করেছিলেন ষোড়শ শতকে। আমরা মাঝে মাঝে থেমে সড়কের কাজ দেখি। একসময় আমরা দিল্লি থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে সেই বিখ্যাত পানিপথে এসে হাজির হলাম। এখানেই বার বার ভারতের ইতিহাসের পট পরিবর্তন ঘটেছে। ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোধিকে হারিয়ে বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। এখানে ১৫৫৬-এ আকবরের সেনাপতি বৈরাম খাঁর কাছে পাঠান সেনানায়ক হিমুর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ১৭৬১-তে এই পানিপথেই আরেক অফগান সেনানায়ক আহম্মদ শাহ দুররানির হাতে পরাভূত হয় সম্মিলিত মারাঠি বাহিনি। আজকের পানিপথে এসব ঐতিহাসিক ঘটনার কোন চিহ্ন নেই, শুধু আছে যুদ্ধের স্মারকরূপে খোদাই করা একটি ফলক। ফলকের কাছে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের কথা স্মরণ করে শিহরিত হলাম। রোমাঞ্চিত হলাম ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রের দাঁড়িয়ে। যদিও সড়কের দু'পাশে কিছু ঝোপঝাড়, খেত-খামার ও অদূরে কিছু ঘরবাড়ি দোকানপাট ছাড়া আর কিছু নজরে এল না। তবে তা ঠিক নয়, চোখ বন্ধ করতেই দেখি, বিশাল রণক্ষেত্রের একদিকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইব্রাহিম লোধির সৈন্যদল, আরেকদিকে বাবরের মোগল সৈন্যদল। হঠাৎ উচ্চনাদে রণদামামা বেজে ওঠে। এখনই শুরু হবে মহারণ। ভাল করে দেখার জন্য চোখ খুলতে দেখি, সব ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার আগে আমরা দিল্লিতে ফিরে এলাম।

কুতুব মিনার / হুমায়ুন টম্ব

জোড়বাগ থেকে অরবিন্দ মার্গ ধরে সাত-আট কিলোমিটার দক্ষিণে দিল্লির প্রান্তসীমানায় দাস সেনাপতি কুতুব-উদ-দিন আইবেকের ভারত বিজয়ের স্মারক কুতুব মিনার। ১১৯৯ সালে কুতব-উদ্‌-দিনের হাতে নির্মাণ শুরু, শেষ হয় ১২৩৬-এ কুতবের জামাতা ইলতুৎমিসের হাতে। আফগান স্থাপত্যে গড়া মিনারটির উচ্চতা ২৪০ ফুট, ভূমির সমতলে ব্যাস ৪৮ ফুট, ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠেছে, শেষ হয়েছে ৮ ফুটে। ৩৬৭ ধাপের ঘোরানো সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। তৎকালীন ভারতের উচ্চতম এই মিনারটি পাঁচতলায় গড়া, প্রতি তলায় আছে রেলিং দেওয়া ব্যালকনি। চারিদিকে বিশাল খোলামেলা চত্বর। পুরো এলাকায় রয়েছে আরো কিছু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

আমরা বেশ কসরৎ করে ৩৬৭ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সর্বোচ্চ উচ্চতার পঞ্চম তলায় উঠলাম। তবে এই সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বেশ কষ্টকর, সিঁড়ির এক একটি ধাপের উচ্চতা এক ফুটের বেশি। শীতের মধ্যেও ঘেমে-নেয়ে উঠলাম। তবে উপরে উঠে মনে হল যেন এভারেস্ট জয় করেছি। উপরের ব্যালকনি থেকে আশে পাশের ও দূরের দিল্লি শহরের দৃশ্য অনবদ্য।

মিনার থেকে নেমে আমরা কুতুব চত্বরে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করি। চত্বর থেকে বের হয়ে হুমায়ুন টম্ব দেখতে যাবার জন্য বাসে উঠলাম।

মথুরা রোডে অবস্থিত দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ– হুমায়ুন টম্ব। ১৫৬২ সালে হুমায়ুনের মৃত্যু হলে তাঁর বেগম হামিদা বানু ১৫৫৬ সালে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করেন। ১৩০ ফুট উঁচু অষ্টকোণী পীতাভ লাল বেলেপাথরের সুরম্য সৌধটি মোগল স্থাপত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন, পরবর্তীকালে তাজমহল তৈরিতে এই সৌধ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এর স্থাপত্যকলার অনেকখানি অনুসরণ করা হয়েছে তাজমহলের স্থাপত্যে। এক কথায়, বয়স ও স্থাপত্যে এটি তাজের পূর্বসূরি। এর নির্মাণে লাল বেলেপাথরের সঙ্গে আরো নানাবর্ণের পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। খিলানের জাফরির কাজ অনবদ্য। অতি বর্ণাঢ্য মনোরম মোগল উদ্যান চারবাগের মাঝে পারস্যরীতিতে গড়ে তোলা এই অনিন্দ্যসুন্দর সমাধিসৌধটি দর্শনার্থীদের বিমোহিত করে। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ ১৮৫৭ সালে সিপাহি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য এখানে এসে লুকিয়েছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ব্রিটিশেরা তাঁকে এখান থেকে বন্দী করে সুদূর ব্রহ্মদেশের ইয়াঙ্গুনে নির্বাসন দেয়।

বিদায়পর্ব

আমাদের ট্রেনিং ক্লাস চলে ১৫ জানুয়ারি দুপুর পর্যন্ত। বিকেলে বিদায়ী 'ভেলেডিক্টরি সেশন'-এ NITHE-এর পক্ষ থেকে আমাদের আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়। আমরাও NITHE-এর অধ্যক্ষ, পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

রাতে ফেয়ারওয়েল ডিনারের পর আমরা পরিচালক সাক্সেনাসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। উষ্ণ আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য সাক্সেনাসাহেবের কথা আমাদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে। ভারতের দুই অংশগ্রহণকারী ডিনারের পর বিদায় নিলেন। তাঁদের আর আমাদের সঙ্গে জোড়বাগের রেস্ট হাউসে রাখা গেল না।

পরদিন সকালে নেপালের কিরণ যোশী ও সন্তোষ ভট্টরায়, পাকিস্তানের ইউসুফ আলী ও সোলাঙ্গি, শ্রীলঙ্কার ডি সিলভা ও আমাদের আশরাফ যে যার গন্তব্যে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেনে বা প্লেন ধরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে আমার আত্মীয়ের বাসায় যেখানে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে উঠেছে, সেখানে যাবার জন্য আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। একটা মাস আমরা একত্রে কাটিয়েছি। একসঙ্গে নানা জায়গা ঘুরেছি, কত হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করেছি। আজ বিদায়ের সময় আত্মীয় বিচ্ছেদের মত মনটা বেদনায় ভারী হয়ে এল। জীবনে হয়তো আর কোনদিন এদের সঙ্গে দেখা হবে না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জোড়বাগ রেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম।

জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, ভ্রমণলেখক

শেষ পাতা

প্রজাতন্ত্র দিবস

প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এটি ভারতের জাতীয় দিবস। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় গণপরিষদে সংবিধান কার্যকর হলে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কার্যকর হওয়ার ঠিক দুই মাস আগে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান অনুমোদিত হয়।

২৬ জানুয়ারিকে সংবিধান কার্যকর করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ ১৯৩০ সালের ঐ দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের ঘোষণা দিয়েছিল। এ দিন সারা ভারতেই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানটি হয় নতুন দিল্লির রাজপথে। ভারতের রাষ্ট্রপতি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পর ভারত ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন। স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হওয়ার মাধ্যমে। এর ফলে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে গিয়ে কমনওয়েলথ অফ নেশনস-এর অন্তর্গত অধিরাজ্য হিসেবে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। এদিন ভারত স্বাধীন হলেও দেশের প্রধান হিসেবে রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন তখনও বহাল ছিলেন। তখন দেশে কোন স্থায়ী সংবিধান ছিল না; ঔপনিবেশিক ভারত শাসন আইনে কিছু রদবদল ঘটিয়েই দেশ শাসনের কাজ চলছিল। ১৯৪৭ সালের ২৮ আগস্ট স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ঐ বছরের ৪ নভেম্বর কমিটি একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদে জমা দেয়। চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিনব্যাপী গণপরিষদে এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য ১৬৬ বার অধিবেশন ডাকা হয়। এসব অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। বহু বিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের ৩০৮জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের হাতে-লেখা দু'টি নথিতে (একটি ইংরেজি ও অপরটি হিন্দি) স্বাক্ষর করেন। এর দু'দিন পর দেশব্যাপী সংবিধান কার্যকর হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের প্রধান কর্মসূচী পালিত হয় রাজধানী নতুন দিল্লিতে। এ দিন রাজপথে আড়ম্বরপূর্ণ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় যা ভারতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ২০১৪ সালে ৬৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসে মহারাষ্ট্র সরকার প্রথমবার দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের অনুকরণে মেরিন ড্রাইভে তাদের কুচকাওয়াজের আয়োজন করেছিল।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির আবাসস্থল রাষ্ট্রপতি ভবনের নিকটবর্তী রাইসিনা হিল থেকে রাজপথ বরাবর ইন্ডিয়া গেট ছাড়িয়ে। কুচকাওয়াজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি রাজপথের একপ্রান্তে অবস্থিত ইন্ডিয়া গেটে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত নাম না জানা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক *অমর জওয়ান জ্যোতি*তে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর ঐ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার পরবর্তী বিভিন্ন যুদ্ধে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে নিহত সৈন্যদের প্রতি রাষ্ট্রপতির এই শ্রদ্ধা নিবেদন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হন এবং প্রধান অতিথির সঙ্গে রাজপথে অবস্থিত অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে আসেন। রাষ্ট্রপতির অশ্বারোহী দেহরক্ষীরা তাঁদের পথপ্রদর্শন করেন।

বিটিং রিট্রিট-এর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি সূচিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের ৩দিন পর, ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সামরিক বাহিনির তিন প্রধান শাখা ভারতীয় স্থলসেনা, ভারতীয় নৌবাহিনি এবং ভারতীয় বায়ুসেনা এ রিট্রিটে অংশ নেয়। রাজপথের প্রান্তে ভারতের কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও রাষ্ট্রপতি ভবনের নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকের মধ্যবর্তী রাইসিনা হিল ও বিজয় চকে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারতের রাষ্ট্রপতিকে তাঁর অশ্বারোহী দেহরক্ষীরা পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। তিনি উপস্থিত হলে প্রেসিডেন্টস বডিগার্ডস-এর অধিনায়ক তাঁর বাহিনিকে জাতীয় অভিবাদনের নির্দেশ দেন। এরপর সামরিক বাহিনি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে। এই সঙ্গীতের পাশাপাশি সম্মিলিত স্থল, জল ও বায়ুসেনার বিভিন্ন ব্যান্ড, পাইপ, ভেরী প্রভৃতির বাদ্যকুশলীরা অনুষ্ঠানের অন্তিমলগ্নে *সারে জাঁহা সে আচ্ছা* প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গানের আয়োজন করে।

১৯৫০ সাল থেকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অথবা গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সাম্মানিক প্রধান অতিথি হিসেবে বরণ করা হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আরউইন মঞ্চ, কিংসওয়ে, লালকেল্লা ও রামলীলা ময়দানে এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সাল থেকে বর্তমান স্থানটি নির্দিষ্ট হয়। অতিথি রাষ্ট্র কে হবে তা নির্ধারিত হয় কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দশকে বেশ কিছু জোট নিরপেক্ষ ও পূর্ব ব্লকের রাষ্ট্রকে ডাকা হয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে অনেক পাশ্চাত্য নেতাকেও ডাকা হয়েছে। • নিজস্ব প্রতিবেদন

উপরে
১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ডেপুটি হাই কমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকা। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের অনুরোধে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কার্যক্রম-স্থগিত নাইটিংগেল মেডিক্যাল কলেজের এসব শিক্ষার্থী ঢাকার বিভিন্ন খ্যাতনামা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ লাভ করে

নীচে
২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকায় একাডেমিক এন্ড পাবলিশার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ২০১৭-এর নির্বাহী কমিটির দায়িত্বগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ছাড়াও অর্থমন্ত্রী এএমএ মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, এসোসিয়েশনের সভাপতি ওসমান গনি এবং পশ্চিমবঙ্গের পাবলিশার এন্ড বুক সেলার'স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন

ডিসেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যায় ঢাকার ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত লোকসংগীত সন্ধ্যায় ভারতের ড. স্বপন মুখার্জির নেতৃত্বে আইসিসিআর দলের পরিবেশনা

উপরে
১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যায় ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত লোক সংগীতসন্ধ্যায় কিরণচন্দ্র রায় ও চন্দনা রায় মজুমদারের পরিবেশনা

নীচে
৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যায় জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সংগীত ও আবৃত্তিসন্ধ্যায় শ্রীমতী মীরা মণ্ডল ও ড. নিমাই মণ্ডলের পরিবেশনা

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য
জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক,
টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন,
লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in
/IndiaInBangladesh
@ihcdhaka
/HCIDhaka